অগ্রন্থিত রোকেয়া

অগ্রন্থিত রোকেয়া

সম্পাদনা :

অভিজিৎ সেন

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

AGRANTHITA ROKEYA

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

সূচি

ভূমিকা

"...যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।...

আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ-রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী-মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।"

—অগ্রন্থিত রোকেয়া-রচনার এ-ও এক উদাহরণ। এই কথাগুলি রোকেয়া লিখেছিলেন 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত "আমাদের অবনতি" প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধটিই রোকেয়ার প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয় "স্ত্রীজাতির অবনতি" শিরোনামে। কিন্তু 'মতিচূর' বইটির কোথাও এই বিস্ফোরক মন্তব্যগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে না। মূল প্রবন্ধটির ২৩ থেকে ২৭পর্যন্ত পাঁচটি অনুচ্ছেদ গ্রন্থ প্রকাশের সময় বর্জন করেছিলেন রোকেয়া, অবশ্য সে জায়গায় সংযোজিত হয়েছিল সাতটি নতুন অনুচ্ছেদ।

১৩১১ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'নবনূরে' প্রকাশিত হয়েছিল রোকেয়ার প্রবন্ধটি, আর আশ্বিন-কার্তিক মাসেই তুমুল প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছিল সে প্রবন্ধের; 'নবনূর' পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল সেসব বিরূপ সমালোচনা, কেউ বলেছিলেন—"নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।" ["অবনতি প্রসঙ্গে"—এস. এ. আল্ মুসাভী, 'নবনূর', আশ্বিন ১৩১১] কেউ-বা লিখেছিলেন—"...এ অবান্তর কথাগুলি না লিখিলে কি আপনাদের অবনতির কারণ অনুসন্ধানে কোন বাধা জন্মিত?... আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।" ["একেই কি বলে অবনতি?" —নওশের আলী খান ইউসফজী, 'নবনূর', কার্তিক ১৩১১] প্রবন্ধ প্রকাশের এক বছর পরে ১৩১২ ভাদ্রের 'নবনূর' পত্রিকাতেই 'গ্রন্থ-সমালোচনা' বিভাগে 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড বিষয়ে এইরকম মন্তব্য চোখে পড়ে—"মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাব্‌কাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।"

এইরকম এক সমাজেই ছিল বেগম রোকেয়ার একলা-পথে-চলা। এক উদাসীন নির্দয় সমাজে মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রোকেয়ার তীব্র লড়াই-এর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সমকালীন নানা পত্র-পত্রিকায়। বেগম রোকেয়ার এই একলা লড়াই হয়তো একালের কোনো মেয়েকে মনে করিয়ে দেয় আরো একশ বছর আগে মেরি ওলস্টোন্‌ক্রাফ্‌টের সংগ্রাম; হয়তো মনে পড়ে *A Vindication of the Rights of Woman* বইয়ে তাঁর লেখা উৎসর্গপত্রের এই কথাগুলিও—

"Contending for the rights of woman, my main argument is built on this simple principle, that if she be not prepared by education to become the companion of man, she will stop the progress of knowledge and virtue; for truth must be common to all, or it will be inefficacious with respect to its influence on general practice."

মনে পড়ে, ১৯০৪ সালে লেখা বেগম রোকেয়ার "স্ত্রীজাতির অবনতি" প্রবন্ধও পরিশেষে জানিয়েছিল—"...আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই।... আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, এ কথা নিশ্চিত।"

সব যুগের, সব দেশের সচেতন মেয়েরই একই অনুভব। ভাবনায় অগ্রসর যে মেয়েই ভালোবেসেছে মেয়েদের, স্বপ্ন দেখেছে মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের, নিজের সচেতন শ্রমে তার পথ গড়তে চেয়েছে, তারই আকাঙ্ক্ষায় ধরা দিয়েছে এই একই চেতনা।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বেগম রোকেয়ার লেখালেখিরও শুরু। ১৯০২ সালেই রোকেয়া রচনা করেছিলেন 'পদ্মরাগ' নামে এক উপন্যাস —তাঁর একমাত্র উপন্যাস। (যদিও গ্রন্থাকারে সেটি প্রকাশ পেয়েছিল অনেক বছর পরে—১৯২৪ সালে) 'পদ্মরাগে'র রচনাকালের সমসময়ে, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ রচনা করছিলেন 'চোখের বালি',তারও পরে রচনা করেছেন 'নৌকাডুবি', যখন তাঁর মনে হয়েছে 'স্বামীত্ব' মেয়েদের কাছে একটি আইডিয়া। স্বামীকে তারা 'ব্যক্তি' বলে না দেখে 'স্বামী' বলে দেখে বলেই অনায়াসে প্রথম জাগ্রত ভালোবাসাকে নিঃশেষে ভুলে অচেনা স্বামীত্বের চরণবন্দনাতেই নারীজন্ম সার্থক করতে পারে। এ বিশ্বাস স্থায়ী হয় নি রবীন্দ্রনাথের কলমেও, কিন্তু 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে'র যুগ পার হয়ে এলেও 'পদ্মরাগ'-এর প্রকাশকালেও রচিত হয় নি 'যোগাযোগ' (১৯২৯)—যেখানে মেয়েদের যন্ত্রণার জগতের অনুভব ভাষা পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, জানা গেছে—এমন কিছুও আছে মেয়েদের জীবনে, সন্তানের জন্যও যাকে খোওয়ানো যায় না। কিন্তু, এক অনগ্রসর, অচেতন সমাজের বুকে দাঁড়িয়েও কতদিন আগে রোকেয়া লিখেছিলেন 'পদ্মরাগ' —এক তারিণীভবনের ছবি এঁকেছিলেন

সেখানে, যেখানে নানা ধর্মের, নানা বর্ণের নির্যাতিতা, নিপীড়িতা, সমাজ-নিষ্পেষিতা, স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়েদের ভিড়; নির্যাতনের স্মৃতির জ্বালা নিয়ে, পরিত্যক্তা হওয়ার বেদনা বহন করে চোখের জলে দিন কাটায় না তারা, আর্তের জন্য সেবাব্রত আর অশিক্ষিত নারীসমাজের জন্য শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণের পাশাপাশি সেখানকার প্রতিটি লাঞ্ছিতা মেয়ে এই সংকল্পেও প্রদীপ্ত—"...আমিও দেখাইতে চাহি যে, দেখ, তোমাদের 'ঘর-করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে। স্বামীর 'ঘর-করাই' নারীজীবনের সার নহে। মানব-জীবন খোদাতালার অতি মূল্যবান দান—তাহা শুধু 'রাঁধা-উনুনে ফুঁ পাড়া—আর কাঁদা'র জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে। .... " ('রোকেয়া রচনাবলী', পৃঃ ৩৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।)

—এই শিক্ষা মেয়েরা নিজের জীবন থেকেই পায় বলেই, পুরুষের ভাবনার অনেক আগেই সরব হতে পেরেছিল নারীর কলম।

২.

তবে, সে সময়ের সব মেয়েই কি আর বেগম রোকেয়ার মতো সময়ের আগে ভাবনা- চিন্তা করছিলেন? রংপুরের পায়রাবন্দ্ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী পরিবারে, জহীর মহম্মদ আবু আলী সাবের-এর ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন রোকেয়া, ১৮৮০ সালে ; যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স উনিশ, যখন তিনি রচনা করে চলেছেন 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। শৈশবে রোকেয়ার কাছে কি পৌঁছত চারপাশের জগতের ভাবনার স্রোতের কণামাত্রও? এমন এক পরিবারে জন্মেছিলেন রোকেয়া, যেখানে আর্থিক সচ্ছলতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না, যেখানে রোকেয়ার দুই দাদা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স্ কলেজে, কিন্তু পড়াশোনায় অত্যন্ত আগ্রহ দেখে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে রোকেয়ার দিদি করিমুন্নেসার—এজন্য শুধু রোকেয়ার পিতাকে দোষারোপ করা চলে না, সমাজের ধারাই যে তখন ঐরকম। কীরকম অবরোধের আতঙ্কে বাস করতে হয়েছে শিশু রোকেয়াকে, পরিণত বয়সে নিজেই তার বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি—বাড়িতে বাইরের অভ্যাগত মেয়েরা এলেও পাঁচ বছরের রোকেয়াকে লুকিয়ে থাকতে হত চিলেকোঠার ঘরে—"আমার খাওয়ার খোঁজ খবরও কেহ নিয়ত মত লইত না। ...প্রায় সমস্তদিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম।" ('অবরোধ-বাসিনী', পৃ: ৪৮৯, 'রোকেয়া রচনাবলী')।

এই নিশ্ছিদ্র অবরোধের অন্ধকারে একমাত্র আলোকশিখা ছিল রাতের পড়াশুনোর সুযোগ। গভীর রাতে পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে গেলে দাদা ইব্রাহিম সাবের, রোকেয়াকে পড়াতে বসতেন সংগোপনে। আর, 'সমাজের বহু নিন্দা ও ভ্রূকুটি' সয়ে রোকেয়াকে 'দু হরফ বাংলা' শিখিয়েছিলেন দিদি করিমুন্নেসা। এই অগ্রজ আর অগ্রজাকে রোকেয়া সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন গ্রন্থ-উৎসর্গের পাতায়, আর জীবনের শেষ বাইশ বছর উৎসর্গ করেছিলেন স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেনের স্মৃতি-চিহ্নিত বালিকা-বিদ্যালয়ের পরিচালনায়। আঠারো বছর বয়সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল

রোকেয়ার। দু'জনের বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও উদারচেতা, প্রগতিশীল স্বামীর আনুকূল্য আর উৎসাহেই রোকেয়ার লেখালেখি প্রকাশ্যে এল, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হতে শুরু করল, ১৩০৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নবপ্রভা'-য় প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম প্রবন্ধ—"পিপাসা"। আর, একবার দু'দিন গৃহস্বামীর গৃহে অনুপস্থিতির অবসরে ইংরেজিতে লেখা হ'ল রসে-ব্যঙ্গে ভরা নক্শা Sultana's Dream। যা পড়ে মুগ্ধ সাখাওয়াৎ পুরুষজাতির প্রতিনিধি হয়েও বলে উঠেছিলেন—'a terrible revenge!'

১৯০৯ সালে সাখাওয়াৎ হোসেনের অকালমৃত্যু রোকেয়ার কলমও থামিয়ে দেয় সাময়িকভাবে। প্রবন্ধের বই 'মতিচূর'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে, সে বছরই *Indian Ladies Magazine* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল Sultana's Dream (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯০৮)। ১৯২১ সালে দীর্ঘ বিরতির পর প্রকাশ পায় রোকেয়ার দ্বিতীয় প্রবন্ধ-সংকলন ' মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২৪ সালে একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ', আর ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হল 'অবরোধবাসিনী'।

৩.

এই তো পাঁচটি বই, (আরো কিছু পত্রিকায় ছড়ানো প্রবন্ধ ; কবিতা) আর এই তো এক বিশ শতকের শুরুর যুগের বাঙালী মেয়ের জীবনচরিত—এমন কী আছে এর মধ্যে, যে তাঁর লেখা আরো অন্য প্রবন্ধও খুঁজে খুঁজে বার করে পড়তে হবে আমাদের?

সে যুগের সাধারণী বাঙালী মেয়েদের তুলনায় বাক্যে ও কর্মে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন রোকেয়া—শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত বাঙালী মুসলমান মেয়েদের জন্য একটা বিদ্যালয় খুলেছিলেন, অনেক শ্রমে, নিষ্ঠায়, অর্থব্যয়ে, সমালোচনায় জর্জরিত হতে হতেও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রতিষ্ঠানটিকে ; আর বাংলার সমস্ত মুসলমান মেয়ের সামগ্রিক কল্যাণের দায়বদ্ধতা নিয়ে গড়েছিলেন 'অঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিনে-ইসলাম' বা 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি'—এইজন্যই কি রোকেয়াকে মনে রাখবেন আজকের দিনের মেয়েরা? আজকের সচেতন মানুষ?

কিন্তু, এ কাজগুলো যদি না-ও করে উঠতে পারতেন রোকেয়া, তবু, শুধু তাঁর লেখার জগৎই তাঁকে স্মরণীয়তা দিতে পারত।

শুধু অন্তরের সৃষ্টিশীলতার আবেগকে মুক্তি দেবার জন্যই কোনোদিন কলম হাতে তুলে নেন নি রোকেয়া, তাঁর বাক্য ও কর্ম আজীবনই পরস্পরের পরিপূরক—সত্য আত্মীয়তায় যুক্ত। তাই, তাঁর কলমের শাণিত ভাষা উঠে এসেছে তাঁর গভীর ভাবনামথিত বক্তব্য থেকেই। রোকেয়ার লেখায় আছে কয়েকটি বিরল বৈশিষ্ট্য—যুক্তিপ্রাধান্য, স্পষ্টতা আর ব্যঙ্গবিদ্রূপের শক্তির সঙ্গে মিশেছে রঙ্গরসিকতার সরসতা! দেশসুদ্ধ পাগলকে মুক্তি দিয়ে সুস্থ মানুষদের কারাগারে বন্দী করে রাখার কল্পনা যেমন অবাস্তব ; পুরুষমানুষদের, অন্ততঃ যারা সমাজে নানারকম অনিষ্ট করতে সক্ষম, তাদের অবাধ বিচরণের অধিকার দিয়ে

অবলাদের অবরোধে বন্দিনী করাও তেমনি হাস্যকর—সুযোগলোভী পুরুষ-সমাজকে এমন লঘুসুরে এমনি তীব্র ব্যঙ্গই করেছিলেন রোকেয়া তাঁর স্বপ্নপুরীর বিবরণে ('সুলতানার স্বপ্ন')। আর তেমনি কঠিন ব্যঙ্গে চোখের জলে মেশামেশি অভিজ্ঞতার বিবরণী তাঁর 'অবরোধবাসিনী'—পর্দার স্বাভাবিক শালীনতার নামে আতিশয্যময় অবরোধ-আশ্রয়ে যে মিথ্যা সম্মানরক্ষার দায় মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল সমাজ, মেয়েদের বৃহত্তর অংশই দিনযাপন আর প্রাণধারণের দায়ে জীবন্মৃত হয়ে জীবনধারণের এই গ্লানিকে বহন করে চলছিল নীরবেই, সমাজ প্রণেতাদের সম্পর্কে তীব্র ব্যঙ্গ আর সেই ভারবাহী অভাগিনীদের প্রতি সমবেদনার কারুণ্য নিয়েই অনেক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন বেগম রোকেয়া।

নারীর ওপর সমাজের অত্যাচারের যেমন ধর্মভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই, সম্প্রদায়ভেদ নেই ; তেমনি বাংলা জুড়ে, ভারত জুড়ে সব ধর্মের, সব বর্ণের, সব সম্প্রদায়ের মেয়েদের ভালোবেসেছেন রোকেয়া, ভেবেছেন এক অখণ্ড ভারত-নারীর প্রতিমার কথা : ১৯২৭ সালে 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি'র এক সভায় সভানেত্রীর অভিভাষণে তাই বলেছিলেন—"ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন ? সে জীব ভারত-নারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই।"

তাই, রোকেয়াই জানেন, এবং জানান যে, ধর্ম-বর্ণ-দেশ-জাতি নির্বিশেষে সব মেয়েরা এক জাত এবং যে জাতের "গৃহ বলিতে একটি পর্ণকুটিরও নাই। প্রাণীজগতে কোনো জন্তুই আমাদের মতো নিরাশ্রয়া নহে। . . ." ("গৃহ", 'মতিচূর' প্রথম খণ্ড, পৃ: ৭৪, 'রোকেয়া রচনাবলী') মনে পড়েই যায় ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্-কে, তিনিও খুঁজে পান নি মেয়েদের জন্য 'a room of one's own'.

সমস্ত অসহায় মেয়ের সঙ্গে এইভাবে ভালোবাসার সমীকরণে নিজেকে মিলিয়ে নিতে নিতে রোকেয়া দেখেন, মেয়েদের ওপর সব নির্যাতনের, সব অসাম্যের মূলে আছে তাদের অশিক্ষা। তাই, আবারও ঝলসে ওঠে রোকেয়ার লেখনী—শিক্ষায় নারী-পুরুষের অধিকারের অসাম্যের বিরুদ্ধে! "অর্ধাঙ্গী" প্রবন্ধে সবিদ্রূপে রোকেয়া জানান—"স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন, এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন, এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন।"

শিক্ষার শক্তিতে আত্মসচেতন নারী গড়ার লক্ষ্যেই জীবনপাত করেছিলেন রোকেয়া, তাঁর রচনাও ধরে রেখেছে সেই সচেতনতা। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার লাভকে ঘিরে যখন সমাজ জুড়ে আতঙ্ক আর সন্দেহের ছায়া, তখন পথের সমস্ত বাধাকে নির্মূল করতে চেয়ে বেগম রোকেয়া শতাব্দীকাল আগেই শুনিয়েছিলেন নারী-শিক্ষার পক্ষে এক সহজ কিন্তু অসামান্য যুক্তি—"শিক্ষা স্ত্রীলোক-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা বাঞ্ছনীয়। স্থলবিশেষে অগ্নি গৃহদাহ করে বলিয়া কি কোন গৃহস্থ অগ্নি বর্জন করিতে পারে ?" ("নার্স নেলী", 'মতিচূর' দ্বিতীয় খণ্ড, 'রোকেয়া রচনাবলী', পৃ: ২০৭)

৪.

তাই, রোকেয়াকে যে চিনতে হবে আজকের দিনে, পড়তে হবে তাঁর অজানা প্রবন্ধমালা, এ আমাদেরই দায়বদ্ধতা—আমাদের শিকড় খোঁজার দায়।

সে দায় স্বীকার করে নিয়েই, এপার বাংলায় যতটা না হোক, ওপার বাংলায় বেগম রোকেয়াকে কেন্দ্র করে উৎসাহ ও চর্চা যথেষ্ট—বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'রোকেয়া রচনাবলী' ছাড়াও, রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যভিত্তিক একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে। সম্প্রতি এপার বাংলাতেও উৎসাহ দেখা দিয়েছে রোকেয়া-চর্চায়। নয়া উদ্যোগ প্রকাশিত রোকেয়ার অগ্রন্থিত প্রবন্ধের এই সংকলনও এক উজ্জ্বল উদ্ধার।

এই সংকলনের অধিকাংশ প্রবন্ধই (কূপমণ্ডূকের হিমালয়দর্শন, নারীপূজা, মোসলমান কন্যার পুস্তক সমালোচনা, দজ্জাল) 'মহিলা' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত, "আশাজ্যোতিঃ" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'নবনূর' পত্রিকায়, "প্রেমরহস্য" 'ভারত মহিলা' পত্রিকায়, "কাটা মুণ্ড কথা কয়" 'বঙ্গলক্ষ্মী' এবং "গুলিস্তাঁ" ও "কৌতুক-কণা" 'গুলিস্তাঁ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া, সংযোজিত হয়েছে 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-কৃত 'মতীচূর-সমালোচনা'। এই সমালোচনায় স্বকালের চোখে বেগম রোকেয়ার ছবিটি চিনে নেওয়া যায়।

সম্প্রতি 'প্যাপিরাস'-প্রকাশিত 'রোকেয়া' নামের ছোট্ট জীবনীগ্রন্থটিতে এই প্রবন্ধগুলির বেশ কয়েকটিরই উল্লেখ পেয়েছিলাম। সেই আলোচনায় উল্লেখিত মূল প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ আকারে পড়বার আগ্রহ আর আকাঙ্ক্ষা তখনই জেগেছিল মনে। এতদিনে, এই সংকলনটি সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করল।

প্রথম প্রবন্ধটির নামকরণেও আছে রোকেয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—কূপমণ্ডূকের হিমালয়দর্শন। প্রবন্ধ-সূচনায় আক্ষেপ করেছিলেন রোকেয়া—বইতে পড়া সাগর, পাহাড, ঝর্ণার বর্ণনা চিরদিন মনে দর্শনের ক্ষুধাই জাগিয়েছে, নিবৃত্তি ঘটবে—এমন ভরসা ছিল না। ক্ষোভও ছিল, সুদূর ইউরোপ থেকে দর্শনার্থীরা হিমালয় দেখে যায়, শুধু ভারত-নারীরই অগম্য থেকে যান নগাধিরাজ। বিশ শতকের শুরুর দশকের মেয়ে মায়াসুন্দরীর কথা মনে পড়ে, দেশবিদেশের লোক দেখে যায় অথচ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলে হাওড়া ব্রিজ দেখা হয়ে ওঠে না তার—এই ছিল তার আক্ষেপ। মায়াসুন্দরী তো পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করেছিল তার অবরুদ্ধ ইচ্ছার কথা, এইরকম কত ছোট ছোট প্রকাশ-না-পাওয়া ব্যথা আর পূরণ-না-হওয়া ইচ্ছের কষ্ট বুকে নিয়ে নিশ্চুপ হয়েই ছিল বাংলার ঘরে ঘরে কত মেয়ে। বেগম রোকেয়া তো তাদেরই প্রতিনিধি, তাদেরই একজন।

কার্সিয়ং পৌঁছানোর এই ভ্রমণবিবরণীটিতেও অবলা নামে চিহ্নিত মানবজাতির অর্ধাংশের ভাবনা ভোলেন নি রোকেয়া। পাহাড়ে শ্রমশীলা, উপার্জনসক্ষম ভুটিয়ানীদের ভারি ভারি পাথর বওয়ার কাজ করতে দেখে সবিদ্রূপে জানতে চেয়েছেন 'অবলা' অভিধা তাদের জন্যও নির্ধারিত কিনা। আর, পরিশেষে হিমালয়ের অটল গাম্ভীর্যে, ঝর্ণার চপল ছন্দে

বিমুগ্ধ রোকেয়া স্মরণ করেছেন এই অনুপম সৌন্দর্যের স্রষ্টাকে; রোকেয়া লিখেছেন—চিত্র দেখেই চিত্রকরের নৈপুণ্য বোঝা যায়, আর আমাদের মনে পড়ে যায় আর এক হিমালয়-পথিককে—১৮৫৭ সালে হিমালয়ের পথে পথে পরিভ্রমণরত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে ভেবেছিলেন—"ঈশ্বরের কোন্ কার্য না আশ্চর্য!" ছোট ছোট সুগন্ধি বুনো ফুল দেখে ভেবেছিলেন—"এই পুষ্পসকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল।" আর 'কূপমণ্ডূক' রোকেয়া ভেবেছেন, টিয়াপাখির মতো কণ্ঠস্থ বাক্যের উচ্চারণে উপাসনার তৃপ্তি কোথায়? "প্রাকৃতিক সৌন্দর্যদর্শনকালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া ওঠে—'ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য! তিনিই ধন্য!' তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।"

'নারী-পূজা' প্রবন্ধটি কথোপকথনের ভঙ্গিতে লেখা—হিন্দু ও মুসলমান, দুই পরিবারেরই শিক্ষিত, সচেতন চারটি মেয়ে পারস্পরিক আলাপের মধ্য দিয়ে খুঁজে চলেছেন—কোন্ সমাজেই বা তাঁদের জন্য মর্যাদার আসন পাতা আছে। 'মহিলা' পত্রিকার তিনটি সংখ্যা জুড়ে (১৩১২—পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন) রোকেয়া রচনা করেছিলেন নারীমর্যাদার এই বিশ্লেষণী ছবি।

"আশাজ্যোতিঃ" প্রবন্ধে রোকেয়া আশায় উৎফুল্ল—আলিগড়ে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন তাঁকে উৎসাহিত করেছে, মনে করিয়ে দিয়েছেন রোকেয়া, অনেকদিন আগেই নাবীর জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করেছিলেন তিনি ('মতিচূর'-এর "বোরকা" শীর্ষক প্রবন্ধে); আর জানিয়েছেন—"স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষেরা সর্বদা হীনবুদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাই অবলারা নিজেকে নিতান্ত মেধাহীন ভাবিয়া ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা আর জ্ঞানচর্চার দিকে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। কোন ভাল লোককে ক্রমাগত পাগল বলিলে সত্যই সে পাগল হইয়া যায়!" আর, প্রবন্ধের শেষে রোকেয়া সগর্বে বলেন—"শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবালাকে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না, সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা এ 'ডানাকাটা' অবস্থায়ও তাহারা সুবিধা পাইলে পুরুষের তুলনায় তাহাদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায়।" তবুও, কতদিন লেগেছে অশিক্ষার এই কারাগারের দ্বারমোচন করতে, অন্ধ দেওয়ালে কতই না মাথা ঠুকতে হয়েছে রোকেয়ার মতো চক্ষুষ্মানদের!

ব্রাহ্ম গিরিশচন্দ্র সেন-এর 'ধর্মসাধননীতি' বইটির সমালোচনা লিখেছিলেন রোকেয়া 'মহিলা' পত্রিকায়। অ-মুসলমান গিরিশচন্দ্র যে 'কূট সমালোচনার ভাষা'য় নয়, 'ভক্তের ভাষা'য় ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন,—এই পর্যবেক্ষণ তৃপ্তি দিয়েছিল রোকেয়াকে। খোলা তরোয়াল হাতে সমাজের যে সব 'কাটমোল্লা'রা ধর্মকে

সম্পত্তি মনে করে আগলে রেখেছেন, তাঁদের সম্পর্কে রোকেয়ার ব্যঙ্গও বর্ষিত হয়েছে এ-প্রবন্ধে। ধার্মিকদের অনুরাগিণী, কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীদের সমালোচনায় অক্লান্ত এক অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিষ্ঠ রোকেয়াকে চিনে নেওয়া যায় এই পুস্তক-সমালোচনা থেকে।

ধর্মে অটল নিষ্ঠা সত্ত্বেও, ধর্মকে শুধু উচ্চারণ-নির্ভর, আচরণীয় সংস্কার বলে কোনদিনই মনে করেন নি রোকেয়া। বাংলা অনুবাদে 'কেয়ামত-নামা' পড়ার পর লেখা তাঁর প্রবন্ধটি তারই একটি দৃষ্টান্ত। এই ভারতের ত্রিশ কোটি নিরন্ন নরনারীর দিনযাপনের যন্ত্রণার সঙ্গে, জীবিকাহীন মানুষের প্রাণধারণের গ্লানির সঙ্গে রোকেয়া মিলিয়ে নিয়েছিলেন ধর্মের পরীক্ষাসেতু 'পোলসেরাত'-কে। রোকেয়ার ধর্মভাবনার গভীরতার অনুভবকেই ধরে রেখেছে তাঁর "দজ্জাল" প্রবন্ধ।

আদি-অন্তহীন এক প্রেমের বিবরণ দিয়েছেন রোকেয়া তাঁর "প্রেম-রহস্য" রচনায়। তাহেরা নামে এক বৃদ্ধার এই আত্মকথনে প্রণয়পাত্র তিনজন—তিনজন তিন ধর্মের, কিন্তু মিল একটি জায়গায়—তিনজনেই নারী। পড়তে পড়তে মনে হয়, নারীর প্রতি নারীর এই আত্মহারা প্রেম কেবল তাহেরারই ছিল না, ছিল তাঁর স্রষ্টারও। একটা জিনিস এ-লেখাতেও লক্ষণীয়, তিনটি প্রণয়কাহিনী বর্ণনার মাঝেও, একবার তাহেরার দিদি পরিহাসছলে তার স্বামীকে জানিয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এটাই যে, পুরুষেরা আবহমান কাল ধরে পৃথিবীতে আধিপত্য করছে, "যৎকালে সৃষ্টিজগতের উৎকৃষ্টতমা জীব নারীজাতি তাদের দাসত্ব শকট বহন করে থাকে।" প্রাণভরে মেয়েদের ভালোবেসেছেন আর তাদের দাসত্ব-বহনে কাতর হয়েছেন—এই-ই রোকেয়ার স্বভাবধর্ম।

সামাজিক কুপ্রথা মুসলমান মেয়েদের মাথা কেটে রেখেছে, তবু ঈশ্বরের সেই কাটা মুণ্ডও কথা কইতে শুরু করেছে—"কাটা মুণ্ড কথা কয়" এমনই একটি সত্য ঘটনার বিবরণী। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের বাধা অতিক্রম করে পর্দানশীন মুসলমান মহিলারা কীভাবে আলিগড়ে 'অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সে'র অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন, সেই কাহিনীই এই ছোট্ট লেখাটিতে শুনিয়েছেন রোকেয়া। রোকেয়ার অনেক আশার, অনেক আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নই যেন সার্থক রূপ নিয়েছে এই ঘটনায়।

৫.

'এলেম আমি কোথা থেকে'—শিশুর এই প্রশ্নের উত্তর তার মায়ের কাছে খুব সহজ—'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'। এই অচলায়তনেও কোথাও নিশ্চয় সঞ্চিত হয়েছিল সেই ইচ্ছার শক্তি, তাই অবরোধবন্দী, প্রথাজীর্ণ এই সমাজেও এসেছিলেন বেগম রোকেয়ার মতো অগ্নিপ্রতিমা ; যাঁর স্বপ্ন জাগরণ জুড়ে বাস করেছে বাঙালী জাতি—যিনি এই 'নিরীহ বাঙালী' জাতিকে চাবুক মেরে জাগাতে চেয়েছিলেন, অশিক্ষার অন্ধকার ভেদ করে স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেশ-কাল-জাতি-নির্বিশেষে মেয়েদের ভালোবেসেছিলেন।

সেই চেনা রোকেয়ার তেজস্বিনী মুখশ্রীতেই গভীরতর মাত্রা যোজনা করেছে এই প্রবন্ধগুলি। অগ্রন্থিত এই লেখাগুলির ছত্রে ছত্রেও ধরা দিয়েছেন সেই রোকেয়াই, যিনি জীবনের শেষ রাতেও নিমগ্ন ছিলেন একটি লেখায়—"নারীর অধিকার" নামে অসমাপ্ত সেই লেখাটিতেও তিনি খুঁজছিলেন বিবাহ-বিচ্ছেদে নারীর সম্মত বা অসম্মত হবার অধিকার। [এ লেখাটি গ্রথিত হয়েছে বাংলা একাডেমীর 'রোকেয়া রচনাবলী'-তে] এই প্রবন্ধগুলি থেকেই পেলাম সেই রোকেয়াকে, যিনি চান—"যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক ; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক ; আর যাহার মন আছে, সে চিন্তা করুক।"

বেগম রোকেয়াকে জানা হয়তো আমাদের ফুরাবে না। যতই জানব, তাঁর কাছে বেড়েই চলবে আমাদের দেনা। এই বইটি এ কথাই আমাদের নতুন করে জানিয়ে যায়—সত্য যে কঠিন, সেই কঠিনকেই ভালোবেসেছিলেন বেগম রোকেয়া।

সুদক্ষিণা ঘোষ

কূপমণ্ডূকের হিমালয়দর্শন

এখন আমরা হিমালয়ে আছি। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইল, আমি পর্ব্বত দেখিলাম। পাঠিকাদিগের নিকট হিমালয় নূতন বোধ না হইতে পারে, কিন্তু আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নূতন। পুস্তকে সাগর, ভূধর, নির্ঝর ইত্যাদির বিষয় পাঠে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত—নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতাম, এ সব দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব! বেশী দুঃখ হইত, এই ভাবিয়া যে, সুদূর ইউরোপের লোকেরা আমাদের হিমালয় দেখিয়া যায়; আর আমরাই তাহা দেখিতে পাই না! এত দিনে ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও হিমালয় দেখিলাম।

যথা সময় যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে হিমালয়ান রেল-রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ীর অপেক্ষা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলগাড়ী ছোট। হিমালয়-রেলগাড়ী আবার তাহার অপেক্ষাও ছোট। ক্ষুদ্র গাড়ীগুলি খেলেনা গাড়ীর মত বেশ সুন্দর দেখায়। আর গাড়ীগুলি খুব নীচু;—যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে গাড়ী চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেণ অনেক আঁকা বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল—গাড়ীগুলি "কটাটটা"—শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও গভীর নিম্ন ভূমি, কোথাও অতি উচ্চ (steep) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

মাঝে মাঝে কয়েকটি Refreshment room এবং ষ্টেশন দেখিলাম। প্রায় সব ষ্টেশনেই Ladies waiting room আছে। ঘরগুলি বেশ furnished, আমাদের সহযাত্রী ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই এক একবার নামিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। Waiting room-এ মুখ ধুইবার পেয়ালাও অনেক—এক সঙ্গে চারি জন হাত মুখ ধুইতে পারে। ভগ্নীরা আর কিছু সঙ্গে রাখুন বা না রাখুন, চিরুণী, ব্রাস, পাউডার ত

রাখেন, বাঙ্গালীর মেয়েরা এত অল্প সময়ে এমন ঘন ঘন কেশবিন্যাস করিতে পারে না! যাহা হউক, ইউরোপীয়া ভগ্নীদের স্ফূর্ত্তি খুব প্রশংসনীয়। ওয়েটিংরুমে "ভুটিয়ানী" আয়া উপস্থিত থাকে।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (sea level) হইতে তিন হাজার ফীট উচ্চে উঠিয়াছি; এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভিতর দিয়া চলিয়াছি! নিম্ন উপত্যকায় নির্ম্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখিযা সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড় বড় ঘাস আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। হরিদ্বর্ণ চায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে! দূর হইতে সারি সারি চারাগুলি বড় সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সঙ্কীর্ণ পথগুলি ধরণীর সীমন্তের ন্যায় দেখায়! নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকা বাঁকা সিঁথি!!

রেলপথে অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীম-বেগে হিমাদ্রির পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে! ইহাদেরই কোন একটি বিশালকায়া জাহ্নবীর উৎস, একথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড় ঝরণার নিকট ট্রেণ থামিল, আমরা ভাবিলাম, যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই, সেই জন্য বোধ হয় গাড়ী থামিয়াছে! (বাস্তবিক সে জন্য কিন্তু ট্রেণ থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেইখানে জল পরিবর্ত্তন করা হইতেছিল।) যে কারণেই ট্রেণ থামুক—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফীট উর্দ্ধে উঠিয়াছি তবু শীত অনুভব করি না, কিন্তু গরমের জ্বালায় যে এতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম। অল্প অল্প বাতাস মৃদুগতিতে বহিতেছে। এইখানে ৪১২০ ফীট উচ্চে "মহানদী" ষ্টেশন। ষ্টেশনের নামটা খুব ভালমতে পড়িতে পারি নাই; যত দূর দেখিয়াছি,তাহাতে বোধ হয় "মহানদীই" নাম। যাহা হউক, যদি ষ্টেশনের নামে ভুল হইয়া থাকে, তাহা আমার দোষ নহে—ষ্টেশন হইতে আমার গাড়ীর দূরত্বের সে দোষ!

অবশেষে কারসিয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফীট। ষ্টেশনে অত্যন্ত ভীড় দেখিয়া আমি Ladies waiting room-এ একটু বসিলাম। ইউরোপীয়া ভগ্নীদের মুখ ধোয়া এবং কেশবিন্যাস দেখিলাম। একজনের সঙ্গে কচি ছেলে ছিল, তিনি আয়াকে ছেলের মুখ ধোয়াইতে হুকুম দিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেলেন। আয়ার কি গরজ, যে ছেলের মুখ ধোয়াইবে? সে তাঁহার পরিত্যক্ত তোয়ালে দ্বারা ছেলের মুখ মুছাইয়া অনুমান দশ সেকেণ্ড দেরী করিয়া গাড়ী অভিমুখে ছুটিল। চাকরের উপর নির্ভর করিলে ঐরূপ হয়ই। ট্রেণ ছুটিলে ভীড় কম হইল, তখন আমরা ওয়েটিংরুম ছাড়িয়া উঠিলাম।

ষ্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূর নহে, শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিলাম। আমাদের

ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জ্জিলীঙ্গের ঠিকানায় book করা হইয়াছিল। জিনিষপত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্ব্বে) গৃহসুখ (at home) অনুভব করিতে পারি নাই! সন্ধ্যার ট্রেণে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জ্জিলীং যাইবার পূর্ব্বে আমাদের জিনিষ পত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল! পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্ব্বত্য বসন্তকাল বলিলে কেমন হয়? সূর্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর এক দিনমাত্র সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ু ত খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভাল নহে। আমরা পানীয় জল ফিলটারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী, পুষ্করিণীও নাই—সবেধন নির্ঝরের জল। ঝরণার সুবিমল সুশীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, স্পর্শনে হস্ত জুড়ায়, এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শীতল বাতাসে, না, ঘন কুয়াসায় প্রাণ জুড়ায়!!

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হালকা। বায়ু এবং মেঘের লুকাচুরি খেলা দেখিতে বেশ চমৎকার! এই মেঘ এদিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল,—মেঘখণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন অস্তমান রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া মনোহর সৌন্দর্য্যের রাজ্য রচনা করে। পশ্চিমগগনে পাহাড়ের গায়ে তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড খণ্ড সুকুমার মেঘগুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ু-ভরে ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটি করিতে থাকে! ইহাদের এই তামাসা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোন কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার "মহিলা"য় ঢেকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেকি শাককে আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূতত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, কারবণিফেরাস যুগে বড় বড় ঢেকিতরু ছিল। এখন সেই ঢেকিতরু স্বচক্ষে দেখিলাম—ভারি আনন্দ হইল! একটা ডাল ভাঙ্গিয়া মাপিলাম ১১ ফীট লম্বা! স্বয়ং তরুবর অনুমান ২০/২৫ ফীট উচ্চ হইবে।

কোন কোন স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই; তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি। আমরা নির্জ্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভালবাসি। সর্প এবং ছিনে-জোঁক আছে। এ পর্য্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই তিন বার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এ দেশের স্ত্রীলোকেরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটীয়া চাকরাণী "ভালু" বলে, "জোঁকে কি ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়।" ভুটীয়ানীরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মত করিয়া পরে, কোমরে এক খণ্ড কাপড়

জড়ান থাকে, গায়ে জ্যাকেট, এবং বিলাতী শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই এক মন বোঝা লইয়া অনায়াসে প্রস্তর-সঙ্কুল আবুড়া খাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে; ঐরূপে নীচেও যায়! যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস 'গায়েব' হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে উঠে!

"মহিলা"র সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন যে, "রমণী জাতি দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা।" জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানীরাও ঐ "অবলা" জাতির অন্তর্গতা না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষের প্রত্যাশী নহে; সমভাবে উপার্জ্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশী বোঝা বহন করে না! অবলারা প্রস্তর বহিয়া লইয়া যায়। "সবলেরা" পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকারাও যোগদান করে। এখানে "সবলেরা" বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

ভুটিয়ানীরা "পাহাড়নী" বলিয়া আপন পরিচয় দেয়, এবং আমাদিগকে "নীচেকা আদমী" বলে! যেন ইহাদের মতে "নীচেকা আদমী"ই অসভ্য! স্বভাবতঃ ইহারা শ্রমশীলা, কার্য্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু "নীচেকা আদমী"র সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশঃ সদ্‌গুণরাজি হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্প স্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশান ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার "নীচেকা আদমি"র সঙ্গে বিবাহও হয়! ঐরূপে উহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে।

মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত পর্দা রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, একথা অনেকেই বুঝে না। তাই তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মহা বিপদ্‌ ভাবে। শাস্ত্রে পর্দাসম্বন্ধে যতটুকু কঠোর ব্যবস্থা আছে, প্রচলিত পর্দা প্রথা তদপেক্ষাও কঠোর! যাহা হউক কেবল শাস্ত্র মানিয়া চলিলে অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত পর্দা সেই রক্ষা করে, যে সমস্ত মানবজাতিকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড় একটি ঝরণা বহিতেছে; এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে না?

অধিক কি বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি; বাকী ছিল পর্ব্বতের একটু নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধ ত মিটে নাই! যত দেখি, ততই দর্শন-পিপাসা শতগুণ বাড়ে! বিভু কেবল দুইটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন? যত

দেখি, যত ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই।

প্রত্যেকটি উচ্চ শৃঙ্গ, প্রত্যেকটি ঝরণা প্রথমে যেন বলে, "আমায় দেখ! আমায় দেখ!" যখন তাহাকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখি, তখন যেন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে, "আমাকে কি দেখ? আমার স্রষ্টাকে স্মরণ কর!" ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়। নতুবা কেবল নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত বৃহৎ, কত বিস্তৃত—কি মহান্! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্ট জগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র! —বালুকাকণা বলিলেও বড় বলা হয়!

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণ কীর্ত্তন না করি, তবে কি কৃতঘ্নতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে, তবে তৃপ্তি হয়। কেবল টীয়াপাখীর মত কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্ততঃ আমার মতে) উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপাসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনকালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে, "ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য! তিনিই ধন্য!" তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।

কূপমণ্ডূকের হিমালয়বর্ণনা আজি এইখানে সমাপ্ত।

খর্সিয়াং, আশ্বিন। (Mr.) R. S. Hossein.

মহিলা, কার্ত্তিক ১৩১১

নারী-পূজা

"হিন্দুর নারীমর্য্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়", একখানি পুরাতন "ভারতী" পত্রিকার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমি বলিলাম, "হিন্দুর নারীমর্য্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়। অন্য কোন দেশে রমণীর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন হয় না। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী।"

আমার কথা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। জমিলা বেগম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"মাফ করুন মিসেস চাটার্জ্জি! এ দেশে ললনার পদ দাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে!"

জমিলা একজন বিখ্যাত উকিলের পত্নী; কুসুমকুমারী রায়ের সহিত ইঁহার খুব বন্ধুত্ব। অপর কামিনী আমেনা বেগম বিধবা; ইনি দশ বৎসর পশ্চিমে ছিলেন; খুব ভাল উর্দ্দু জানেন। ইনিও কুসুমের প্রিয় বন্ধু। মিসেস রায়ের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতা এত অধিক যে, ইঁহারা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন। উক্ত মোসলেম রমণীদের সহিত আমার পরিচয় মাত্র দুই তিন মাস হইল হইয়াছে; কিন্তু কুসুম আমার সমবয়স্কা বাল্য-সখী।

কুসুমের বসিবার কক্ষে বসিয়াই আমি "ভারতী" দেখিতেছিলাম। আমি তর্কের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না; তথাপি আমার ঐ উক্তি লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিল। আমেনা বেগম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"এ দেশে রমণী জাতি পুরুষের নিজস্ব সম্পত্তিবিশেষ!"

আমি : ইহা আপনাদের ভ্রম। হিন্দু নারীকে শ্রদ্ধা না করিলে, তাহাকে দেবী রূপে কল্পনা করিত না। অধিকাংশ দেবতাই নারী।

আমেনা : আমরা কিন্তু ফল দেখিয়া বিচার করিতে চাই! দেবী কল্পনার কথা ছাড়িয়া সত্য ঘটনা দেখান।

আমি : ও ভাই কুসুম! তুমি আমায় সাহায্য কর। আন ত তোমার মহাভারত খানা, ইঁহাদিগকে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখাই।

কুসুম : তোমরা তিনজনেই আমার সমান শ্রদ্ধার পাত্রী, আমি কাহারও পক্ষপাতিতা করিতে পারি না। মহাভারত বা ইতিহাসে কাজ কি? বর্ত্তমান সামাজিক ঘটনার আলোচনা করিতে পার।

আমি : (মোসলেম কামিনীদ্বয়ের প্রতি) আপনারা কি দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ ভারত-ললনাকে দাসী বলিতে চান?

জমিলা : না। সতী সাবিত্রী প্রভৃতি নিজগুণে ধন্যা হইয়াছেন। সীতা নিজে ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ তাঁহাকে কি রূপে পূজা করিয়াছিল?

আমি : (ও কথার উত্তর না দিয়া) পুরাকালে অনেক দেবী ছিলেন। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বিদুষী ললনা ভূতলে অতুল।

আমেনা : তাঁহারা বিদুষী ছিলেন. সে গুণ তাঁহাদের নিজের। এখানে কথা হইতেছে, নারীর প্রতি সমাজের ব্যবহারের। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্না ছিলেন। আজিও পল্লীগ্রামে এমন কৃষক নাই যে, দুই চারিটি খনার বচন না জানে। কিন্তু—

আমি : কিন্তু আর কি? গ্রামে গ্রামে খনার বচন আবৃত্তি করা হয়, ইহাতেই বুঝা যায়, খনা সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইতেছেন!—

আমেনা : ক্ষমা করুন, মিসেস্ চেটার্জ্জি। আমার কথাটুকু শেষ হইতে দিন! খনা এখন পূজিতা হইতেছেন, কিন্তু তিনি মরিয়াছেন কি প্রকারে তাহা কি আপনি বিদিত নহেন? তাঁহার যে রসনা ঐ বচনগুলির জনয়িত্রী, সেই রসনা ছেদন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে!

আমি · হত্যা ত করা হয় নাই; —তবে হাঁ, —খনার রসনা কর্ত্তিত হইয়াছিল।

জমিলা : 'হত্যা' কি গাছে ধরে? খনার স্বামী তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিলে পর খনা নীরবে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

কুসুম : আপনারা পুরাতন কথা ছাড়ুন। বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘটনা দ্বারা জয় পরাজয় দেখা যাউক।

আমি : বেগম সাহেবেরা দুইজন, আর আমি একা। জোর যার, মুলুক তার, সুতরাং আমি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করি।

কুসুম : সে কি! তুমি এত শীঘ্র তর্ক ছাড়িবে কেন? যত দূর পার অগ্রসর হও।

আমেনা : আমরা দুইজন হইলেও মোটের উপর আপনার তুলনায় দুর্ব্বল। কারণ, আপনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা; —(ঈষৎ হাস্যে) যদিও এফ্, এ, ফেল! আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া এবং নানা পুস্তক পাঠে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর আমরা কঠোর অবরোধে থাকি,—আমরা কেবল কুসুমদিদিকে জানি, আর চিনি আপনাকে।

আমি : বেশ, বেশ, চলুন; আপনারা নাছোড় বান্দা! কুসুমদিদি! 'বর্ত্তমান শতাব্দী' মানে বাঙ্গালার ১৩১২ সন, না? খ্রীষ্টাব্দের ২০শ শতাব্দী?

কুসুম : ত্রয়োদশও নয়, বিংশও নয়; —এই শেষ একশত বৎসরের ভিতরের ঘটনা ধর না।

আমি : বেশ! ইদানীং ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হওয়ায় রমণী জাতি কল্পিত দেবত্বের পদ হইতে ক্রমে সত্যকার দেবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিলা : তাহা কতক পরিমাণে সত্য। আপনি আর একটী কথা শুনিয়া রাখুন, —আপনারা যখন হিন্দু সমাজের দেবী লইয়া গৌরব ও গর্ব্ব করেন, তখন উক্ত সমাজের দোষকেও আপনাদের নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকুন।

আমি : এ বড় শক্ত condition!

কুসুম : শক্ত হইলেও পণটা ন্যায়সঙ্গত বটে। উঁহারা পূর্ব্বেই তোমার ফাঁকির পথ বন্ধ করিলেন! বুঝিলে, প্রভা দিদি?

আমি : কি রকম ফাঁকি?

কুসুম : উঁহারা কোন হিন্দু পরিবারের অবলার দুর্দ্দশার কথা বলিলে তুমি বলিতে পারিতে, "আমাদের ব্রাহ্মসমাজে কিন্তু ওরূপ হয় না!"

আমি : তাহা ত ঠিক। ব্রাহ্মসমাজে অবলাপীড়ন হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে কি?

আমেনা : যদি কেবল নববিধান সমাজ লইয়া থাকেন, তবে আপনারা হিন্দুসমাজের দেবী লইয়া টানাটানি করেন কেন? কেবল গুণের প্রশংসার ভাগ লইতে অগ্রসর হইবেন, আর দোষের নিন্দা গ্রহণ করিবেন না, ইহা ত বড় অবিচার!

জমিলা : এই জন্য আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছিলেন, এখন বুঝিলাম। তবে থা'ক, নারী পূজার আলোচনায় কাজ নাই, অন্য কথা পাড়ুন।

আমি প্রথমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলাম, একটু পরে ভাবিলাম, "আমি এতই ভীরু যে বিনা তর্কে হারিব?" প্রকাশ্যে বলিলাম—

"না বেগম সাহেবা! আপনাদের ভয় নাই! আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না, —চলুন!"

সকলে হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগকে হাসানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে আর সামাজিক কথা বলিতেছিলেন না। তাহা আমার অসহ্য হইল, আমি জেদ ধরিয়া বলিলাম, —

"কই বেগম সাহেবা, আপনি ত একটীও প্রপীড়িতা ললনার কাহিনী বলিতে পারিলেন না!"

জমিলা : বলিলে, "একটি কেন, অনেক বলা যায়", —"সে বহ্নির শত শিখা কে করিবে গণনা?"

আমি : আপাততঃ একটী শিখাও দেখান দেখি!

জমিলা : বেশ। যে সকল হিন্দু রমণী পূজিতা হন. সেই হিন্দু কুলকামিনীর ভাষায় ত আমরা শুনিতে পাই।

"সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দুর সন্তানে,
গড়া কি তোদের বুক নিরেট পাষাণে?
* * *
বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি
* * *
নাই দয়া নাই ধর্ম্ম, বোঝে না'ক কর্ম্মাকর্ম্ম
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়।"

কি বলেন ভাই ! ঐ কয় ছত্র পদ্যকে ব্যথিত হৃদয়ের 'আর্ত্তনাদ' না পূজা প্রাপ্তিতে হর্ষে 'আশীর্ব্বাদ' বলিব?

আমি : উহা ত কবির রচনা—কল্পি্‌ ‌ বেদনা।

জমিলা :—আপনি বালবিধবার যন্ত্রণাকে কল্পিত বেদনা বলিলেন?

আমিনা : একেবারে কল্পিত নহে, অনেক পরিমাণে সত্য, —

কুসুম : ধ্রুব সত্য।

আমিনা : কিন্তু উহা ত সামাজিক নিয়ম, কাজেই সহিতে বাধ্য হওয়া যায়।

আমেনা : কবিকল্পনার কথা ছাড়িয়া আমি সদ্য দেখাই, ভারতবর্ষ কি কি উপাদানে নারী পূজা করে, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত[১] "Heart Beats" গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন?

আমি প্রথমে ভাবিয়া দেখিলাম, উক্ত গ্রন্থে কেবল পারমার্থিক কথা আছে। একটু চিন্তা করিয়া শেষে সাহসের সহিত বলিলাম, "হাঁ দেখিয়াছি। তাহাতে কোন ললনা-দলনতত্ত্ব নাই।"

(ক্রমশঃ)

মহিলা, পৌষ ১৩১২

নারী-পূজা * (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমেনা : মূল গ্রন্থে নাই বটে, কিন্তু মেঃ এস. জে. ব্যারোস্‌ কর্ত্তৃক লিখিত[১] মজুমদার মহাশয়ের জবানীতে একটি নমুনা পাওয়া যায়।

আমি : অবলাপীড়নের নমুনা? —আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে?

*** উক্ত গ্রন্থ হইতে কোন কোন অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। সেই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ স্বয়ং মাতৃহারা পুত্রের ভাষায়ই চমৎকার শুনায়,—**

আমেনা স্থির স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটনা। যৎকালে মজুমদার মহোদয়ের জননী ওলাউঠা রোগে আক্রান্তা হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, তখন গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছিলেন!* বাড়ীর গাভীটার কোন রূপ পীড়া হইলেও বোধ হয় কর্ত্তা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বিধবার প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ হয়, তাহা মজুমদার মহোদয়ের ভাষায় চমৎকার শুনায়! আপনারা তাঁহার জীবনীর ১৪শ হইতে ১৬শ পৃষ্ঠা পুনরায় পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গৃহপালিত কুকুর বিড়ালও বোধ হয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না; আর ঈশ্বরের সৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠতমা জীব, পরিবারের এক জন বধূ রোগের যন্ত্রণায় অধীরা, কেহ তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই! বিধবার জন্য চিকিৎসক ডাকিতে হইবে, এ কথাও কেহ ভাবে নাই! মজুমদার স্বয়ং তাঁহার পিতৃব্যদেব সুখনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু কর্ত্তাদের কক্ষে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই!** "চাকরটা পর্য্যন্ত চিকিৎসক ডাকিতে যাইবে না, —না যাউক। কিন্তু পুত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না! যাঁহার জননী জন্মের মত বিদায় লইতেছে, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন? না! তিনি পাগলের ন্যায় পথে ছুটিলেন, —(স্বর্গীয়) কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সকলেরই গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক ডাক্তারের বাড়ী গেলেন; ডাক্তারের চাকর হতভাগ্যকে তাড়াইয়া দিল! সে ভৃত্যটি তো ভারতবর্ষেরই পুরুষ, সে অবশ্যই জানিত, কিরূপে নারী-পূজা করিতে হয়। তাই বিধবার জন্য প্রভুকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, ভাবিয়া সে মাতৃশোকাতুর পুত্রকে তাড়াইয়া দিল!!

"আমরা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই উনবিংশ বর্ষীয় বালক মাতৃশোকে পাগল প্রায় হইয়া পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। আর তাঁহার হৃদয়ে কি আকুলতা, কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ছিল, তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। আমরা ঈশ্বরের যত

* "Everybody in the house was up except my uncle, who was the *Karta* (Head). Nobody seemed to care to call in a doctor … My perplexity may be imagined."

** Rushing to speak to my uncles, I was not admitted to their rooms; and no one, not even a servant, would go for a medical man. Maddened and despairing, I rushed into the streets, tried to call up Keshub and other friends; but every gate was shut for the night. I ran to a doctor's house in the neighbourhood, but his servant turned me out. I don't know into how many places I went, and pleaded my poor, dying mother's case, but could not get medical help.

"…What need to bewail the world's hard heartedness? What need to curse the selfish cruelty of men and women to the wretched, forsaken Hindu widow? ..

"But if men were more compassionate, and society recognised their (women's) rights to the commonest necessaries of life, perhaps they would be less hard on themselves, and many a heart-stricken son would be spared, the misery I felt when I found my mother's beloved life sink under the load of the world's neglect and indifference."

প্রকার আশীর্ব্বাদ ভোগ করি, তন্মধ্যে মাতৃচরণ শ্রেষ্ঠতম আশীর্ব্বাদ। সব সুখসমৃদ্ধি তুলাদণ্ডের এক দিকে, আর মা এক দিকে!!

"ইহাকে—বিধবার প্রতি এইরূপ নির্ম্মম নির্দ্দয় ব্যবহারকে যদি আপনারা 'নারী-পূজা' বলেন, তবে আর আমার বলিবার কিছু নাই।"

আমি : ঈদৃশী ঘটনা বিরল। কেবল একটী বিধবার প্রতি যত্ন হয় নাই বলিয়া সকলে দোষী হইতে পারে না।

কুসুম : না প্রভা দিদি! ওরূপ ঘটনা বিরল নহে—তবে কথা এই যে, আর কেহ মজুমদার মহাশয়ের মত ঐ প্রকার কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া রাখে না, তাই আমরা সে সব ঘটনা জানিতে পারি না। আমিও দুই চারিটি পরিবারের ঐ রূপ অবস্থা জানি।

আমি : (জমিলা বেগমের প্রতি) আর আপনি? আপনি কোন লোমহর্ষণ ব্যাপার অবগত আছেন?

জমিলা : একটী ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সে অনেক কথা!

আমি : বলুন, শুনি।

জমিলা বলিলেন, —"একজন বড় লোকের শিশুকন্যা পীড়িত ছিল। বাড়ীতে দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ী, যত প্রকার বিলাসদ্রব্য হইতে পারে, সবই প্রচুর ছিল। কেবল কন্যা জাতিতে অভিশাপ মনে করা হয় বলিয়া খুকীর চিকিৎসা হইতেছিল না।

"কোন অভাব নাই—অপর শিশুরা টাকা লইয়া ছিলিমিলি খেলা করে, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, এ চিন্তা গৃহিণীর সহ্য হইল না! তিনি বারম্বার সবিনয়ে সজল নয়নে কর্ত্তাকে চিকিৎসক ডাকিতে অনুরোধ করিলেন, —কর্ত্তা শুনিলেন না! এমন-কি কর্ত্তা একদিন নিজের প্রয়োজনবশতঃ ডাক্তারের নিকট যাইতেছিলেন, সেই সময় কর্ত্রী সকাতরে বলিলেন, 'খুকীর অবস্থাও ডাক্তারকে জানাইও।' 'মেয়ে কি কখনও মরে?' এই বলিয়া কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন।

"অতঃপর অসহায়া গৃহিণী উপায়ান্তর না দেখিয়া মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পুংশাবককে যখন পিতা হনুমান বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন শাবকটীকে বক্ষে লইয়া হনুমানমাতা বনে জঙ্গলে পলায়ন করিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করে! কিন্তু পর্দ্দানশীন মহিলা পিতৃ-অত্যাচার হইতে শিশুকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? নগরে অসংখ্য ডাক্তার আছেন, —থাকুন; তাহাতে অন্তঃপুরিকার লাভ কি?"

আমি : "ঈস্! মানুষ এমন পাষণ্ড হয়! শেষে কি হইল ভাই? শিশুটি বাঁচিল, না অযত্নে মারা গেল?"

জমিলা : "শিশুটি শেষে বাঁচিল। যৎকালে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতা রোদন করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবাৎ উক্ত পরিবারের ভাগ্যবান্ জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় গিয়াছিল।

সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাই মাতার ক্রন্দনে তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, সে নিজে ডাক্তারের নিকট গিয়া কয়েক মাত্রা ঔষধ আনিয়া দিল। সে ঔষধ আনিয়াছিল কেবল জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য! ঈশ্বরকৃপায় সেই সামান্য ঔষধে খুকী বাঁচিল। সেই ধনী পরিবার অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে! সেই শিশু, সেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা—সকলেই জীবিত আছেন!!"

আমি : "পরিবারটি হিন্দু, না মুসলমান?"

জমিলা : "তাহা আমি বলিব না, —তাঁহাদের মুখে মসীলেপন করিয়া কাজ কি? এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট—তাঁহারা বঙ্গবাসী!"

আমি : "দেখুন, এদেশে যে জঘন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাই সব অনিষ্টের মূল। মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহারা চাকরের সম্মুখেও বাহির হন না, এই জন্য মোসলেম রমণী একেবারে নিরুপায়া। ঐ পর্দ্দা তাঁহাদিগকে পশু—হনুমানমাতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অসহায় করিয়াছে।"

(ক্রমশঃ)

মহিলা, মাঘ ১৩১২

নারী-পূজা (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমেনা : অবরোধ প্রথা জঘন্য হইলেও উহা আমাদের হাড়ে-মাংসে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা যতদিন ভদ্র শিষ্ট হইতে না শিখেন, ততদিন এ পর্দ্দা ছাড়া সহজ নহে। পুরুষসমাজ যদি ললনাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিতেন. তবে আর দুঃখ ছিল কি?

কুসুম : আমি শুনিয়াছি যে, অন্যান্য মুসলমান প্রধান দেশে নাকি ঈদৃশ অন্তঃপুরপ্রথা নাই! তবে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা কেন এরূপ পর্দার সৃষ্টি করিয়া নিজেদের স্ত্রীকন্যার সহিত আমাদিগকেও বন্দিনী করিলেন?

জমিলা : পর্দার আদিস্রষ্টা কে? তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কোন মোস্‌লেম ভ্রাতা যখন অবরোধের অনুকূলে কিছু লিখেন, তখন তিনি বলেন, "আমরাই পর্দ্দার স্রষ্টা. হিন্দুভ্রাতৃগণ যে পর্দ্দার আবিষ্কারক বলিয়া দাবী করেন, তাহা ঠিক নহে।" আবার যে মুসলমান ভাইটি পর্দ্দার প্রতিকূলে কিছু লিখেন, তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, "পর্দ্দার প্রথা মুসলমানেরা বিধর্ম্মীদের নিকট শিখিয়াছে।" যাহা হউক এই প্রথার স্রষ্টা যিনি হউন, ভোগটা আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে!

আমি : আপনারা ধীরে ধীরে পর্দ্দা ছাড়েন না কেন? আমরা ত ছাড়িয়াছি।

জমিলা : আপনারা পর্দ্দাত্যাগে খুব ভাল আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন কই? যে ভাবে পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে অনেক নিন্দা সহিতে হইতেছে।

আমি : নিন্দাকে ভয় করিবার প্রয়োজন?

আমেনা : ভয় না করুন, কিন্তু অনেকে প্রকৃত পর্দ্দার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে পবিত্রতা নষ্ট—

আমি : থামিলেন কেন? বলুন,—

আমেনা : আমি একটা অপ্রিয় কথা বলিতে যাইতেছিলাম, যাহা হউক, সমাজের প্রতিও আমাদের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, কেবল ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য আমরা সে কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে পারি না।

আমি : হিন্দুরা ব্রাহ্মসমাজের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

কুসুম : কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে পর্দ্দাত্যাগে নিন্দা করেন, তাহা শুনিয়া সাবধান হওয়া উচিত। আমেনাদিদি হয়ত ব্রাহ্মসমাজে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতে যাইতেছিলেন।

আমেনা : আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

আমি : কিন্তু মোটের উপর মোসলেম সমাজে যেরূপ রমণী-পীড়ন হয়, সেরূপ আর কোথাও হয় না। আপনারা খনার মৃত্যুর কথা বলিলেন, কিন্তু লাহোরের "আনারকলি"র সমাধি মন্দিরের ইতিহাস জানেন? সম্রাট্ আকবরের আদেশে আনারকলিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইয়াছিল!! পরে সম্রাট্ জাঁহাগীর আনারকলির শবের উপর সেই সুন্দর সমাধিভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন! পরন্তু তাজমহলের অভ্যন্তরেও কোন বিষাদের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে কি না কে জানে?

জমিলা : মুসলমানেরা রমণীদলন করে সত্য, কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে "নারীপূজা করি" বলিয়া ছলনা করে না। বরং এ দেশের কাট-মোল্লারা মনে করে যে, অবলাপীড়ন করাই তাহাদের ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য!

আমেনা : আমার মনে হয়, হিন্দুরা আমাদের নিকট অবরোধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কাট-মোল্লারা হিন্দুর নিকট নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। নতুবা কোরাণ শরীফের বিধান মানিলে অবলা-পীড়নও চলে না; অন্যায় অন্তঃপুরপ্রথাও চলে না।

আমি : আপনারা কি মনে করেন, কাট-মোল্লারা অন্যায় পর্দ্দার পক্ষপাতী?

জমিলা : দেখ ভাই আমেনা! এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!

আমেনা : হাঁ, ঠিক বলিলেন। এখন আমি মোল্লাদের মৌচাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নহি। মোল্লাদের কথা ছাড়ুন, মিসেস চাটার্জ্জি!

আমি : মৌমাছিকে ভয় করিলে আপনারা মধু আহরণ করিবেন কিরূপে?

জমিলা : মধুলুণ্ঠন করিবার সময় ত পূর্ব্বেই সাবধানে যথেষ্ট ধূম অগ্নি লইয়া যাওয়া হয়; এবং সে সময় দুই একটা মৌমাছির দংশন বরং সহ্য হয়! কিন্তু মধু লইতে প্রস্তুত না থাকিয়া অনর্থক মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা বালকোচিত মূর্খতা হইবে। এখানে কথা হইতেছে—অবলাপীড়নের, তাহাই বলুন।

আমি : তাহা ত আপনারা বলিবেন, আমি শুনিব।

আমেনা : বলিবার ত অনেক ছিল; সে সব মর্ম্মভেদী কাহিনী কি বলিয়া শেষ করা যায়? তবে, আজি আর সময় নাই; এখন উঠি কুসুম দিদি!

অতঃপর আমরা স্ব স্ব ভবনে ফিরিলাম।

আর. এস. হোসেন

(মোসলমানকন্যা)

মহিলা, ফাল্গুন ১৩১২

আশা-জ্যোতিঃ

এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। পূর্ব্বাকাশে তবে ও কিসের আলোক দেখা যায়? মাত্র অমানিশা অবসানে আকাশের কোলে শুকতারা দেখা গিয়াছে; ঊষা ও বালার্ক এখনও বহুদূরে।

অনেক সময় মনে করি, আমাদের উন্নতির কোন আশা ভরসা নাই। যে দেশে পুরুষজাতি অবলার প্রতি শত্রুতাচরণই গৌরবের বিষয় মনে করে, সে দেশে আর আশা কি? কিন্তু কালের বিচিত্রগতি সর্বদিন সমান যায় না। এখন দেখি, দয়াময় আমাদের প্রতি সদয় কটাক্ষে চাহিয়াছেন।

বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু অপেক্ষা অধিক উন্নত ও সুশিক্ষিত; পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মুসলমান পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের তুলনায় অনেক হীন ও অধঃপতিত। অতএব কেবল বঙ্গের কতিপয় নারী-বিদ্বেষীর ক্ষুদ্রাশয়তা দর্শনে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নহে।

সমাজের অর্দ্ধঅঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব; এ রহস্য বোম্বাই, লাহোর, ও আলীগড়ের মোস্‌লেম-ভ্রাতৃবৃন্দ বেশ বুঝিয়াছেন। তাই এখন আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয়া পাঠিকা বলিতে পারেন, "আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হইলে আমাদের লাভ কি? আমরা আছি বঙ্গদেশে,—আলীগড় ত বহুদূরে! আমাদের মুক্তির উপায় কৈ?"

মুক্তির উপায় ঐ শিক্ষাবিস্তার। আমরা যদি শিক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবে আলীগড়ের দূরত্ব আমাদিগকে আলীগড়ে পৌছিতে বাধা দিতে পারিবে না! সাধনা ব্যতীত সিদ্ধির আশা করা যায় কি? যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সুশিক্ষা লাভই আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায়, তবে শিক্ষার পথে যতই কন্টক থাকুক না কেন, বিশ্বাসী (বিশ্বাসিনী) তাহা উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইবেই। এবার এলাহ্‌বাদের কুম্ভমেলায়

প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল, —তাহারা কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াছে, কত ব্যক্তি জনতার পদচাপে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। তবু কি তীর্থযাত্রী পুনরায় তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হইবে? কখনই না! তিথি বিশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু কুলবালারা শিবিকাসহ ডুবিয়া স্নান করেন! সুতরাং দেখিতেছেন, বিশ্বাসিনীর শুভকার্য্যে দুর্ভেদ্য পরদাও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

জ্ঞান ধর্ম্মেরই প্রধান অঙ্গ। এককালে মোস্‌লেম সমাজ অতিশয় উন্নত ছিল; কিসের বলে? জ্ঞান-বলে। আজি ইউরোপ ও আমেরিকা সুসভ্য, ধনাঢ্য ও সর্ব্ববিষয়ে উন্নত;—কেন? জ্ঞান বিজ্ঞানের কৃপায়। যে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে চাহিয়া অভাগিনী বঙ্গভূমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারও উন্নতির একমাত্র কারণ—জ্ঞান।

কোন বস্তুই ইচ্ছামাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা জ্ঞানপিপাসা অনুভব করা মাত্রই কেহ সুধাভাণ্ড হস্তে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইবে না! তৃষ্ণার্ত্তের নিকট কূপ আইসে না—পিপাসীকে কূপের নিকট যাইতে হয়। সমাজের একটি সুনীতি একতা—এই একতা স্থাপনের জন্য আলীগড় ও বাঙ্গালাকে একাকার করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি; বাঙ্গালী মুসলমানগণ অত্যন্ত নারী-বিদ্বেষী, ইঁহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি! তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংলণ্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীদের "ব্লুষ্টকিং" বলিয়া[৩] বিদ্রূপ করেন; শিক্ষিতা বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর এক চমৎকার কথা—আমরা পুরুষের রচনায় ইংলণ্ডের সমাজের যত চিত্র না দেখিতে পাই; তাহা মহিলাদের রচনায় দেখিয়া থাকি! মিসেস্ হেন্‌রী উড[৪] এবং মেরী করেলীর উপন্যাসে[৫] অনেক সামাজিক ক্ষত দৃষ্টিগোচর হয়! এমন কি মাননীয়া মেরী করেলী তাঁহার কোন উপাখ্যানের নায়িকা (ডেলিশিয়া)-র প্রিয় কুক্কুরটিকে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন!!* যাহা হউক, এত হিংসাবিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরাজললনা মাথা তুলিয়াছেন; এবং বঙ্গীয়া (ব্রাহ্ম) ভগিনীরাও মাথা তুলিতেছেন; এবার মোসলেম ললনার পালা।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম, "আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব?"** এখন দেখি সত্যই আলীগড়ে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাগারের সূত্রপাত হইতেছে। ইহা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? অবশ্য জেনানা কলেজ এখনও সুদূর ভবিষ্যতের পরপারে। সম্প্রতি কেবল নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে; এ স্কুলটিকে সেই ভাবী জেনানা কলেজের মাতামহী বা

* মেরী করেলী রচিত "Murder of Delicia" দ্রষ্টব্য।

** মতীচূরের "বোরকা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

প্রমাতামহী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কেহ বলিতে পারেন, তবে এখনই এত আশায় উৎফুল্ল হওয়া কেন? আশার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমে বীজ, তৎপরে অঙ্কুর, তারপর বৃক্ষ—সর্ব্বশেষে ফল। আজি যে দীর্ঘ তালতরুটি উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া গগন চুম্বন করিতেছে, ইহার বীজ কবে নিহিত হইয়াছিল? অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে! অতএব আলীগড়ের 'স্কুলবীজ' দেখিয়া আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য আমরা ইহার ফল ভোগ করিতে পাইব না—ফল ভোগ করিবে আমাদের তৃতীয় পুরুষ। যে তালের গাছ বপন করে, সে নিজে কদাচিত ফল খাইতে পায়!

আমরা কেবল আশায় আশ্বস্ত হইলেই কি আমাদের কাজ শেষ হইবে? অবশ্য না। ঐ স্কুলবীজটির প্রতি আমাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে। উপযুক্ত অর্থাভাবে এখনও স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না—আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ভদ্রলোকেরা চাঁদা দেন, ভাল কথা,—যদি না দেন, তবে মহিলাদের চাঁদা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে; যিনি তাহা পালন করিতে ইচ্ছুক, তিনি সেক্রেটরী সাহেবকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। সম্প্রতি চাঁদা সংগ্রহই প্রধান কার্য্য। আলীগড়ের মহানুভব লোকেরা যে মহৎ কার্য্যের আয়োজন করিতেছেন, তাহা দুই চারিজনের দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব। এ সময় যদি সকলে উহাতে যোগদান না করেন, তবে ও স্কুলবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না—যদি ঐ আশাতরু এবার অর্থাভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, তবে আবার বীজ সংগৃহীত হওয়া সুদূর পরাহত। যে মাতৃজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এই আয়োজন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে কেন? আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই।

লাহোর, বোম্বাই ও আলীগড় নিবাসী লোকের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে সকলকে একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষা ইংরাজী হইলে ভাল হয়; নতুবা কোন বিখ্যাত প্রাদেশিক (যেমন হিন্দী) ভাষার চর্চ্চা রাখিলে চলে। লাহোরের লোকে আমাদের বঙ্গভাষা শিখিবে, এরূপ আশা দুরাশা; সুতরাং বাঙ্গালীকেই উর্দ্দু শিখিতে হইবে।

দেশের, বিশেষতঃ নিজের সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে নারী কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। যে শিক্ষা মানবের পক্ষে অশেষ উপকারী, সেই শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত রমণী সামান্য অর্থরূপ স্বার্থত্যাগ করিবে না কি? জ্ঞান বিনিময়ে হজরতা 'হাভা' স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—তাঁহারই দুহিতা হইয়া আমরা কি সামান্য অর্থত্যাগে বিমুখ হইব?

কেহ হয়ত বলিবেন, "একবার আদি জননী জ্ঞানফল চয়ন করায় পিতা আদমকে স্বর্গচ্যুত হইতে হইয়াছে, আবার বঙ্গজননীরা জ্ঞানলাভে অগ্রসর হইলে আমাদিগকে

গৃহচ্যুত হইতে হইবে না ত?" উত্তরে বলা যাইতে পারে, গৃহচ্যুত হওয়ার ত আশঙ্কা নাই—আশঙ্কা আছে, কর্ম্মহীন, আশঙ্কা উদ্যমহীন জড়তারূপ স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার!

আদি মাতা নিষ্কর্ম্মা অলস জীবনের স্বর্গভোগ পরিত্যাগ না করিলে মানব জাতি ধর্ম্মবিশ্বাসরূপ অমূল্যরত্ন পাইত কোথায়? আমাদের মনে হয়, স্বর্গবাসী আদম অপেক্ষা মর্ত্ত্যবাসী দরবেশ মন্‌সুর অধিক সুখী ছিলেন! মহর্ষি মন্‌সুর ঈশ্বর-প্রেমের যে মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন, স্বর্গে থাকা-কালীন হজরত আদম কি সে সুধার আস্বাদ জানিতেন?

স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষেরা সর্ব্বদা হীনবুদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাই অবলারা নিজেকে নিতান্ত মেধাহীন ভাবিয়া ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা আর জ্ঞানচর্চ্চার দিকে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। কোন ভাললোককে ক্রমাগত পাগল বলিলে সত্যই সে পাগল হইয়া যায়! নারীজাতি কি বাস্তবিক হীনবুদ্ধি? না, বরং রমণী প্রতিভার আদি অধীশ্বরী। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে নারীই প্রথমে জ্ঞানফল চয়ন ও ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে পুরুষ তাঁহার (উচ্ছিষ্ট!) প্রদত্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবালাকে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না, সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা এ "ডানাকাটা" অবস্থায়ও তাহারা সুবিধা পাইলে পুরুষের তুলনায় তাহাদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায়। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি, যে ক্ষেত্রে মুসলমান বালক শতকরা ২০/২৫ জন কৃতকার্য্য হয়, সে স্থলে বালিকা (বোম্বাইয়ে) শতকরা ৭৫ জন কৃতকার্য্য হইয়াছে। যে স্বদেশী ব্রত পালনে বাঙ্গালী পুরুষেরা প্রকৃত কার্য্যের তুলনায় ফাঁকা হৈচৈ বেশী করেন, সেই ব্রত 'নভেলপাণি'রা দৃঢ়তার সহিত নীরবে প্রতিপালন করিতেছেন, সুতরাং অবলাদের নিরাশ হইবার কাবণ নাই। সুদীর্ঘ নৈরাশ্য-যামিনীর শেষে আশা-শুকতারা উদয় হইল। এমন সুপ্রভাতে যে নিদ্রিত থাকে, তাহার দুর্ভাগ্য! তাই বলি, ভগিনি! ঐ চাহিয়া দেখুন --ঐ দূরে—আশা-জ্যোতিঃ।

মিসেস্ আর. এস্. হোসেন।

নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

মোসলমান কন্যার পুস্তক সমালোচনা

(নূতন পুস্তক *ধর্ম্মসাধননীতি*)

অদ্য আমার সমালোচনা পাঠাইলাম। আপনার লেখার সমালোচনা আমি কি করিব? "সমালোচনা" বলিতে যেন একটা মরুব্বিয়ানা ভাব থাকে; যেন সমালোচক নিজে একজন মান্য গণ্য লোক। তাই আমি আপনাকেই সম্বোধন করিয়া নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিলাম। আশা করি, ইহা মহিলায় প্রকাশিত করিবেন।

"ধর্ম্মসাধননীতি"তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে,—"ধর্ম্মসাধনা", "অস্কাত্মানুরাগ", "অনুতাপ", "চিত্তসংযমের উপায়", "বাহ্যিক উপাসনা", "আন্তরিক উপাসনা", "জীবন্ত উপাসনা", "নামসাধন", "ধর্ম্মসঙ্গীত", "যোগ ও প্রেমাবেশ", "রোজা" (সংযমব্রত), "নির্ভয়স্থাপন", "সাংসারিক সুখের অসারতা", "কৃতজ্ঞতাতত্ত্ব", "কামনা ও ক্রিয়া", "সাধুচরিত্র", এবং "পরিশিষ্ট—অনুতাপতত্ত্ব", ইহার প্রত্যেকটি বিষয় কিরূপ মূল্যবান্, তাহা সূচীপত্র দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, "সেই মহাগ্রন্থে (অর্থাৎ কিমিয়ায় সাদতে) রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সত্যরত্ন শোভা পাইতেছে।" আমি বলি, আমাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত সত্য সমূহ "রত্ন"-ই বটে—তাই তাহা অতি যত্নে আরব্য ও পারস্য ভাষারূপ লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ; আর সমাজের কাটমোল্লাগণ উন্মুক্ত করবালহস্তে ঐ সিন্দুক রক্ষা করিতেছেন!—যেন একটি রত্নও ভাষান্তরিত হইতে না পারে! যেন আরব্য ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞলোকে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে না পারে।

যখন কোন উদারচেতা মোসলেম ভ্রাতা ঐ গ্রন্থের কোন এক অংশ উর্দ্দু বা বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরেন, তখন আমাদের মনে হয়, যেন সেই রত্নভাণ্ডারের একটি গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে, দর্শকেরা বাহির হইতে তৃষিত নয়নে তাহার শোভা কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছে।

কিন্তু আপনি এ কি করিয়াছেন! রত্নভাণ্ডারের অনেকগুলি বাতায়ন মুক্ত করিয়াছেন!—মোল্লাদের অতি যত্নে রক্ষিত লৌহসিন্দুকও খুলিয়া ফেলিয়াছেন! সহজ সরল বঙ্গ ভাষারূপ ডালায় রত্ন বিতরণ করিতেছেন!! "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে", এই নীতিবাক্যের মর্ম্ম আপনি বুঝিয়াছেন, আপনি বেশ জানেন, বঙ্গের দীনতম ব্যক্তিকেও থালাভরা মাণিক দান করিলেও মহামূল্য "কিমিয়ায় সাদতের" ভাণ্ডার শূন্য হইবে না! তাই অন্নছত্র খুলিয়াছেন, দেখি।

"মহাপুরুষ মোহম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলামধর্ম্ম" গ্রন্থে "আত্মমন্তব্যে" লিখিত হইয়াছে, "একজন (মোসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরশ্ছেদন করিব'।" তাই ত আপনার হাতে লৌহসিন্দুকের চাবি আছে দেখিয়া যে, মোল্লাগণ ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র নয়। আপনার কথা দূরে থাকুক, একজন মোসলমানও (বিখ্যাত "বানাতন্ নাশ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা) উর্দ্দুভাষায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ করায় মোল্লাদের কোপে পতিত হইয়াছিলেন।

"মোসলমান জাতীয় ব্রাহ্মবন্ধু" কথাটা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। জাতিতে মোসলমান, অথচ ধর্ম্ম বিশ্বাসে "ব্রাহ্ম" এরূপ লোকও আছে না কি?

"ধর্ম্মসাধননীতি"র "জীবন্ত উপাসনা" পাঠকালে আমাদের মনে পড়ে হজরত আলীর কথা। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্তে উপাসনা আর কে করিতে পারে? অহোদের যুদ্ধের সময় তাঁহার পায়ে শরবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শরটা বাহির করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হইত, এমন-কি তিনি কাহাকেও সেই আহত পদ স্পর্শ করিতে দিতেন না। তাঁহার বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে আলী মোর্ত্তজা যখন উপাসনা করিবেন, সেই সময় শরমোচন করা হইবে। কার্য্যতঃ তাহাই করা হইয়াছিল। হজরত আলী উপাসনায় এমনই গভীর মগ্ন ছিলেন যে, শরমোচনের বিষয় জানিতেই পান নাই। ধন্য সেই উপাসনা। আর ধন্য সেই ভক্ত উপাসক।

গ্রন্থখানি এমন সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর যে ইহার কোন্ অংশের উল্লেখ করিব, কোন্ অংশ ছাড়িব—ঠিক করা দুঃসাধ্য। আমরা আপনার বিষয়ে ততোধিক চমৎকৃত হই অর্থাৎ আপনি মোসলমান ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি যে ভাষায় লিখেন, তাহা ভক্তের ভাষা—কূট সমালোচকের ভাষা নহে। সহজেই বুঝা যায় যে, আপনি পাদ্রীদের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি বিধানের ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর নহেন। এজন্য আমরা আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সে দিন আমার জনৈকা বন্ধুকে আমি এই গ্রন্থসম্বন্ধে লিখিয়াছি—"মাননীয় বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের[৬] অনুবাদিত অনেকগুলি পুস্তক আমার নিকট আছে। তাঁহার প্রেরিত 'ধর্ম্মসাধননীতি' পাঠকালে আমার মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, না ইসলামধর্ম্ম প্রচারক?"

"ধর্ম্মসঙ্গীত" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। "যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান বা শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীত মোহম্মদীয় শাস্ত্রে সাধনার জন্য সমাদৃত হইয়াছে।" এই কথা লিখিয়া আপনি আমাদিগকে "সঙ্গীত বিরোধী" দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস যে "মোসলমান ধর্ম্মটা বড় 'কট খটে'— কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ।" এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীতবিরোধী মনে করিবেন না।

মোসলমান-শাস্ত্র সঙ্গীতকে সুনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ কবিয়া উহাকে অশ্লীলতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সঙ্গীতশ্রবণে লোকের মন কি বিচলিত (disturbed) হয়? না, বরং উহাতে এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, শ্রোতা একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দেশেই শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য শিশুরঞ্জক সুমধুর ছড়া গীত হইয়া থাকে। ইউরোপে রোগীর নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত সেবিকাগণ গান করিয়া থাকেন। দুই জন মান্য মোসলমান স্বীকাব করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতশ্রবণকালে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উপাসনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক জন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি প্রাতঃকালীন নমাজের সময় গায়কদের ভৈরবী আলাপ শুনিতে শুনিতে যেমন একাগ্রমনে নমাজ পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ আত্মহারা নমাজ জীবনে আর কখনও পড়েন নাই! তবে ঢাকের চড়চড়ি বা আনাড়ী গায়কের গর্দ্দভ-গর্জ্জনের কথা ভিন্ন! তাহাতে ত জলস্থল কম্পিত হয়—আর মানুষের মন চঞ্চল না হইবে কেন?

"কৃতজ্ঞতাতত্ত্বে" শিখিবার বিষয় অনেক আছে। যাহারা আপন অবস্থায় সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহাদেব পক্ষে এ অধ্যায়টি ঔষধস্বরূপ।

"ধর্ম্মসাধননীতি" হিন্দু মোসলমান সকলেরই পাঠ্য হইয়াছে। যিনি একবার ইহা পাঠ করিবেন, তিনি মোহিত হইবেন।

মতীচূর রচয়িত্রী

মহিলা, ভাদ্র ১৩১৩

দজ্জাল

যখন মহিলার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয় মোসলমান শাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন "কেয়ামত" "দজ্জাল" বা "পোলসেরাত" সম্বন্ধে মহিলায় কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না। আমার ত মনে হয়, "মহিলা" যেন আমাদেরই কাগজ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, মোসলমানের ন্যায় খ্রীষ্টানগণও মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এবং মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস করে। কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের কিছুকাল (ধরাতলে হজরত ঈসার পুনরাগমনের) পূর্ব্বে এক বিধর্ম্মী পৃথিবীতে আসিয়া অনেক লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করিবে, তাহার নাম 'দজ্জাল', দজ্জাল মাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে; এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই সে অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে, নিজেকে ঈসা পয়গম্বর (যীশুখ্রীষ্ট) বলিয়া পরিচয় দিবে, সময় সময় ঈশ্বরত্বেরও দাবী করিবে!* দজ্জালের সঙ্গে একটা অগ্নিকুণ্ড (নরক) একটা মনোরম উদ্যান (স্বর্গ) এবং বাহনস্বরূপ একটা গর্দ্দভ থাকিবে।** এই কয়টা জিনিষ লইয়াই দজ্জাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে! এবং দিগ্বিজয়ে সে অনেকটা কৃতকার্য্য হইবে। কারণ সে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে; এবং তাহার সহিত অর্দ্ধ খানি রুটী (অর্থাৎ অন্ন)

---

* "ঈসা পয়গম্বর আমি খোদার রছুল।
আমার কলেমা সবে করহ কবুল।"

অন্যত্র : " হর ঠাঁই যাবে সেই চড়ে এক গাধা।
যারে তারে কবে আমি তোমাদের খোদা।"

"কেয়ামত নামা"

** "বড় এক আতশখানা সঙ্গে হবে তার।
দোজখ বলিয়া নাম রাখিবে তাহার।।
আর এক বাগান তার সঙ্গে সঙ্গে চলে।
রাখিবে তাহার নাম বেহেস্তখানা বলে।।"

থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় তাহার অধীন হইবে। যে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে, যাহার হাতে সমুদায় অন্ন জল থাকিবে, স্বর্গ ও নরক যাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান, সে যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী না'ই করিবে কেন? তাহার কথায় মূর্খ ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাকাতর লোকেরা আপন পৈতৃক ধর্ম্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি না'ই দিবে কেন? পেটের দায় বড় দায়!

যে ব্যক্তি দজ্জালের কথামতে কুপথে যাইবে, তাহাকে সে স্বীয় স্বর্গে স্থান দিবে, আর যে তাহার কথা অমান্য করিবে, তাহাকে ধরিয়া সে নরকে ফেলিবে! স্বর্গের লোভে ও নরকের ভয়ে অনেক লোক দজ্জালের দলভুক্ত হইবে। হায় ক্ষুদ্র স্বার্থ!

কিন্তু দজ্জাল যাহাকে স্বর্গে রাখিবে, সে প্রকৃত পক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং যে তাহার নরকে যাইবে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে!

পাঠিকা ভগিনি! ঐ দজ্জালের বর্ণনা হইতে আপনি আর কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারেন না কি? প্রকৃত দজ্জাল ত পরে আসিবে, কিন্তু এখনই আমরা কি এ জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে দজ্জালের কুহকে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই না?

ক্ষণিক সুখের (দজ্জালের স্বর্গের) লোভে লোকে কি প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অভিশপ্ত দেখে না? আর যে প্রেয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রেয়ঃ পথ অবলম্বন করে সে ক্ষণিক কষ্ট (দজ্জালের নরক) ভোগ করে বটে, কিন্তু সে পরিণামে অনন্ত শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনে প্রধানতঃ দুইটি ভাব দেখা যায়, একটি ইঙ্গিতে সুপথ, অপরটি কুপথ প্রদর্শন করে। আমরা প্রথমোক্ত ভাবকে দেবভাব এবং শেষোক্তকে অসুর ভাব বলিব। দেবভাবের কার্য্য সাত্ত্বিক, আর অসুর ভাবের কার্য্য তামসিক। শাস্ত্রকারদের মতে মানব ফেরেশ্‌তা (ইঞ্জিল বা দেবদূত) ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ! যে ব্যক্তি পশুভাব জয় করিয়া আপন আত্মাকে উন্নত করিতে পারেন, তিনি নরদেবতা; এমন কি তাঁহাকে ফেরেশ্‌তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যে পশুভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু।

দজ্জাল অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ইত্যাদি, অর্থাৎ পতনের পাপপথ কুসুম আস্তৃত এবং সুগম। সুতরাং অবোধ লোকেরা পাপানলে পতঙ্গপ্রায় প্রাণ উৎসর্গ করে। আর ধর্ম্মের বা উন্নতির পথ কন্টকাকীর্ণ, অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়, পদে পদে মানবের পদস্খলন হয়। উন্নতির পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা! ও পথে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ভুজঙ্গের শত ফণা গর্জ্জন করিয়া উঠে। অবনতি স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিলে আর কিছু করিতে হয় না, অনায়াসে গড়াইয়া গড়াইয়া নরককূপে পড়া যায়!

একটি অতি দীর্ঘ সেতুর নাম "পোলসেরাত"। "পোলসেরাত" সেতুটি চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম (সঙ্কীর্ণ) এবং অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ*, তাও আবার সোজা নহে—তিন স্থলে বাঁকা! সে পোলসেরাত নরকের উপর স্থাপিত হইবে।

মহাবিচারের শেষে সকলে ঐ সেতু অতিক্রম করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাইবে। স্বর্গের পথ এমনই কঠিন!—

অমাবস্যার রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে মানবকে ঐ সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ সেতু অতিক্রম করিতে হইবে! পুণ্যবান লোকেরা ত অনায়াসে পার হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু পাপীদের পাপের পরিমাণ অনুসারে বার বার পদস্খলন হওয়ায় তাহারা নরকে পতিত হইবে।

আমরা ঐ দুরূহ সেতুর আর একটি অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? মনে করুন, ঐ পোলসেরাত একটি পরীক্ষা বিশেষ। ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে; যে ফেল (fail) হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই সংসার কি? একটা বিরাট পরীক্ষাক্ষেত্র নহে কি? মানব-জীবন পোলসেরাতের পথেই চলিতেছে না কি? কেহ আরম্ভে, কেহ এক-তৃতীয়াংশ পথে (পোলসেরাতের প্রথম মোড়ে), কেহ অর্দ্ধপথে (অথবা সেতুর দ্বিতীয় মোড়ে), কেহ আর কিছু দূরে (সেতুর তৃতীয় মোড় পর্য্যন্ত) অগ্রসর হইয়া ফেল হয়,—অধিকাংশ লোকেই ফেল হয়। ক্বচিৎ দুই দশ জন ভাগ্যবান্ লোক সফলকাম হয়। কবি বড় নৈরাশ্যে গাহিয়াছেন,—

"মিছে কেন কর বিষয় ভাবনা—
কতই দেখিছ, এ ছার সংসারে
কারুই পূরে না মনোবাসনা।"

এই ভারতের ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্যে কয় জন লোক প্রতিদিন দুই বেলা পূর্ণোদর আহার প্রাপ্ত হয়? কয় জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয় জনে পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয় জন জীবনের এক একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে? কয় জনে জীবনের পথটা কণ্টকময় মনে না করে? তাই কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন—

* "চুল হইতে সরু যে তলওয়ার হৈতে ধার,
অন্ধকার রাত্রি হৈতে সেথা অন্ধকার।।
পোনের হাজার সাল জান সেই রাহা।
তিন বেঁক হবে তাহে এলাহির চাহা।।"

"পোনের হাজার সাল সেই রাহা", অর্থাৎ সেতুটি এত দীর্ঘ যে পদব্রজে চলিয়া উহা অতিক্রম করিতে ১৫০০০ বৎসর সময় লাগিবে!

"জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!"

*　　　*　　　*

তাই ত, একবার এ ভ্রমে পতিত হইলে আর সহজে নিষ্কৃতি নাই।

তাই বলিয়া পোলসেরাত যে একেবারে দুর্গম, তাহাও নহে। অনেকে ধর্ম্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করেন; অনেকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, যিনিই কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাকেই কঠোর পরীক্ষা পোলসেরাত অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

আর এক কথা বলিয়া এখন উপসংহার করি। দজ্জাল ১. যীশুখ্রীষ্টত্বের দাবী করিবে, (অর্থাৎ দজ্জাল খ্রীষ্টান?) তাহার সঙ্গে ২. অর্দ্ধেক রুটী থাকিবে*; যে রুটী থাকিবে যে দেশে সে যাইবে, সেই দেশের ৩. জলের কর্ত্তা হইবে**; (অর্থাৎ তাহার হাতে দেশের অন্ন জল থাকিবে!) ৪. পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য তাহার করায়ত্ত হইবে; ৫ এবং তাহার ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইবে, ইত্যাদি কথার অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে। মোটামুটি ত এই দেখা যায়;—১. খ্রীষ্টান দজ্জাল ২. অন্ন ৩. জল ও ৪. অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর এবং সে ৫. বিজ্ঞান বলে অঘটন ঘটাইতে (অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলাইতে) সমর্থ!!

ঐ দজ্জাল ও পোলসেরাতে প্রচুর নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত। ধন্য সেই ধর্ম্মগুরু (হজরত মহম্মদ), যিনি এত কথা জানিতেন! যিনি এমন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন। ধন্য তিনি! অমর তিনি!!

অবশ্য আমার সাধ্য কি যে আমি দজ্জাল বা পোলসেরাতের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে বা তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি! আমি কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট! তবে বাঙ্গালা "কেয়ামত-নামা" পাঠকালে যাহা মনে উদয় হইল, এস্থলে তাই বলিলাম, আবশ্যক বোধে উক্ত পুস্তকের কোন কোন অংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করা গেল।

যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক, আর যাহার মন আছে, সে চিন্তা করুক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি দজ্জালকে একরূপ বুঝিলাম, আর কেহ হয়ত অন্যরূপ বুঝিবেন, কেহ হয়ত হাসিবেন। যিনি হাসিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি আমার এই বিনীত অনুরোধ যে, হাসিবার পূর্ব্বে তিনি যেন একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

(মোসলমান কন্যা) মতীচুর রচয়িত্রী।

মহিলা, ভাদ্র ১৩১৪

---

*　"সঙ্গে তার হবে আর এক আধা রুটী।
যাহাকে চাহিবে সেই রুটী দিবে বাঁটি।।"

**　"আর তার তাবে হবে দেশে যত পানি।
চাহিলে না দিবে পানি বিনে পেরেশানি।।"

অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে জ্বালাতন না করিয়া দজ্জাল জলদান করিবে না।

প্রেম-রহস্য

কবি বলেন, যাহা সুন্দর মনোহর, মানুষ তাই ভালবাসে। শৈশবে চন্দ্রমার প্রতি আমাদের অকপট ভালবাসার ঐ কারণ। শিশু ফুল ভালবাসে, যেহেতু ফুল অতি সুন্দর। এই নিয়ম অনুসারে যাবতীয় উপন্যাসের নায়িকাই "সুন্দরী" হইতে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে নায়িকা প্রথম দর্শনের নয়ন-রঞ্জন, অতঃপর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থা হইতে পারিত না।

বলি, যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে? —অর্থাৎ যদি কোন কুৎসিত বিশ্রী বস্তুকে ভালবাসে, তবে কি সে কবিসমাজের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে? তা যদি হয়, হউক! প্রেমিক প্রাণ দিতে কাতর নহে।

প্রেম কি? এই রহস্য অতি বড় পণ্ডিতেরাও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, আর তুমি আমি কোন্ ছার? তবে আমি এখন জীবনবর্ত্মের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া এই সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের বহুদর্শিতায় প্রেম সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বুঝিলাম যে, ও রহস্য দুর্ভেদ্য! যিনি প্রেম সম্বন্ধে কোনরূপ বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত 'অন্ধের হস্তী দর্শনের' ন্যায়! —অন্ততঃ আমার ধারণা ঐরূপ!

এস্থলে আমার জীবনের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমি হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান—সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই ভাল বাসিয়াছি। আমি বালিকা, প্রৌঢ়া, প্রাচীনা—সকল বয়সের লোককেই ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু কেন ভাল বাসিয়াছি, তাহা আজি পর্য্যন্ত বুঝি নাই।

আমি কয়েক মাস আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার নিকট উড়িষ্যায় ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার লোকেরা বড় ভীরু প্রকৃতির, আমাদের বাঙ্গালার ত্রিসীমায় (বিশেষতঃ আমার ভগ্নীপতির উপস্থিতি সময়) কেহ আসিত না। আসিত কেবল এক জন! প্রেমিকের অগম্য কোন স্থান নাই—প্রেমিককে গিরি লঙ্ঘন করিতে হয়, বিনা নৌকায় দুস্তর সাগর

পার হইতে হয়, কত কি করিতে হয়,—আর এ "হাকিম বাবুর" বাসাবাটীর নিকট আগমন ত সামান্য ব্যাপার!

প্রত্যূষে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইলে দেখিতাম একটি বালিকা আমাদের বাঙ্গালার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে! আমি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতাম; ঘুরিয়া ফিরিয়া যখনই বারান্দায় আসিতাম, দেখিতাম সেই চক্ষু দুটীর দৃষ্টি আমার প্রতি!

আমার ভগ্নীপতি আফিসে গেলে পর মধ্যাহ্নে যখন আমরা দুই ভগিনী অলস সময় কাটাইবার জন্য কোনরূপ বুনন গাঁথন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতাম, অথবা যখন গল্প করিতে করিতে দিদি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িতেন, আর আমি কোন পুস্তক পাঠে রত থাকিতাম, কবিতার ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহ্য জগৎ ভুলিয়া থাকিতাম,—সেই সময় দৈবাৎ মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতাম, জানালার নিকট বাহিরে দাঁড়াইয়া চম্পা (সেই বালিকা) আমাকেই দেখিতেছে।

একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন আসিস্?"

চম্পা নত মস্তকে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "তোম্হঙ্কু দেখিবাকু" (তোমাকে দেখিতে)। বলিয়াই আবার শঙ্কিতা হইল; সভয়ে আমার মুখ দেখিতে লাগিল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম, বালিকা পলায়ন করিল! বলা বাহুল্য চম্পার কথা শুনিয়া আমার মনে যারপরনাই আনন্দ হইল। আমাকে সে প্রতিদিন দেখিতে আইসে ভাবিয়া কেমন একটু অহঙ্কারও অনুভব করিলাম! মানব হৃদয় বুঝি চিরদিনই প্রেম-ভিখারী, তাই (যদিও আমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না তবু এ অযাচিত প্রেমলাভে, কাঙ্গালের ধনরত্নলাভে আহ্লাদিত ও গর্ব্বিত হওয়ায় ন্যায়, আমিও অতিশয় পুলকিত হইলাম।

সময় সময় দেখিতাম আমাদের ঝী চাকরেরা চম্পাকে তাড়া দিয়া বলিত, "এখানে রোজ কি কর্ত্তে আসিস?" সে বিনীত ভাবে উত্তর দিত, "টিকে তাহাঙ্কু দেখি যাই" (তাঁহাকে একটু দেখে যাই)। একদিন আয়া তাহাকে অতি কর্কশস্বরে আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই চম্পা চলিয়া গেল। আমার বড় দুঃখ হইল। আয়াকে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করায় সে বলিল, "ও যে জাতে চাঁড়াল, ওর ছায়া মাড়া'তে নেই।" তাহার ছায়া মাড়াইলে আয়াকে স্নান করিতে হইত! চম্পা অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া আমি তাহাকে হৃদয়চ্যুত করিতে পারি নাই! সে সুন্দরী ছিল না, বরং অতি কাল কুৎসিত ছিল; তবু আমি তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম।

আমাদের এই নির্ম্মল বিশুদ্ধ ভালবাসা লইয়া দিদিরা আমোদ করিতেন। দিদির এক প্রৌঢ়া ননদ সেখানে ছিলেন; তিনিও আমাদিগকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিতেন। তিনি বলিতেন "তাহেরা (আমি) চম্পার সহিত আবার মধু-মাস (Honeymoon) যাপন করিতেছে!" সে সময় আমার বিবাহিত জীবনের সপ্তম বৎসর ছিল।

সুখের দিন অস্থায়ী। রবিবারে দুলা-ভাই (আমার ভগ্নীপতিকে আমি আশৈশব দুলা-ভাই বলিয়া ডাকিতাম) আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলেন। আমাদের তিন জনকে অর্থাৎ দিদি, দিদির ননদ ও আমাকে কাপড় সেলাই লইয়া ব্যস্ত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমারও কিছু করা উচিত।"

দিদি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, "মাফ কর, আমাদের ছুঁচ কাঁচি নিয়ে টানাটানি করে' কাজ নাই!"

দুলা-ভাই। কেন আমি কি তোমাদের চেয়ে আনাড়ী? তাহেরা সে দিন আমায় "য়্যাহু" বলেছিল, তাই বলে কি আমি সত্যিই য়্যাহু হয়ে গেলাম?

দিদির ননদ। ডীন জে. সুইফটের কল্পনা যে একেবারে সৃষ্টিছাড়া;—হুহন্‌হুম্ দেশে অশ্বজাতি রাজত্ব করে, আর মানুষ (য়্যাহু) তাদের অধীনে থেকে শকটবহন করে!! ঈশ্! কল্পনার আর সীমা নাই!

দিদি। অশ্ব মানুষের উপর প্রভুত্ব করে, এটা আর বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় কি, দিদি? আমাদের সত্যিকার জগতে তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা চিরকাল ঘ'টে আস্‌ছে।

দুলা-ভাই। বটে? সে অদ্ভুত ব্যাপার কি?

দিদি। সে অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে পুরুষেরা আবহমানকাল পৃথিবীতে আধিপত্য করছে, যৎকালে সৃষ্টিজগতের উৎকৃষ্টতমা জীব নারীজাতি তাদের দাসত্ব-শকট বহন করে' থাকে!

সহসা একটা উত্তর যোগাইতে না পারিয়া দুলা-ভাই দিদির দিকে 'কটমট' দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমরা উচ্চ হাস্য করিলাম।

"আমি তোমাদের কর্ম্মশালার কিছু স্পর্শ করিব না—আমি আমার কাজ করি", এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে চুরুট দেশলাই বাহির করিলেন। ধূমপান করাটাও একটা মস্ত কাজ কি না!

দুলা-ভাই চুরুট ফুঁকিতে-ফুঁকিতে জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চম্পাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সকৌতুকে বলিলেন, "কি ছুঁড়ি? তোর নাম কি?" তৎক্ষণাৎ চম্পা পলায়ন করিল!

দিদি বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ! ওকে তাড়ালে কেন, ও যে তাহেরার সখী!"

এই কথায় একটা হাস্য-তরঙ্গ উঠিল, দুলা-ভাই আমার স্বামীকে দয়ার পাত্র বলিয়া আক্ষেপও করিলেন!

পরদিন চম্পা আর আসিল না। স্বয়ং "হাকিম বাবু" (দুলা-ভাই "বাবু" শব্দে আপত্তি করিতেন, কিন্তু গ্রামের লোকেরা কোন মতেই তাঁহাকে "বাবু" বলিতে ছাড়িত না। "সাহেব" শব্দ শিখাইয়া দিলে "সাহেব বাবু" বলিত।) তাহাকে দেখিয়া নাম জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন, ইহাই তাহার ভয়ের কারণ। চম্পার অদর্শনে সমস্ত দিন আমার প্রাণটা কেমন অব্যক্ত যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও বালিকা দেখা দিল না। আমি এক একবার উদাস নয়নে জানালার দিকে চাহিলাম,—প্রত্যেক বারই চম্পার স্থান শূন্য দেখিলাম!

অপরাহ্নে দুলা-ভাইকে দিদি চা খাওয়াতেছিলেন। যখন চা ঢালিবেন ঠিক সেই সময় তাঁহার সাত মাসের খোকা পার্শ্বের ঘরে দাঙ্গা আরম্ভ করিল! দেখিতাম, দিদির উপর খোকার প্রভুত্বই অধিক! সুতরাং তিনি আমাকে চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া খোকার আদেশ পালন করিতে গেলেন।

দুলা-ভাই আমার প্রদত্ত চায়ের স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তাহেরা! আজ তুমি আছ কোথায়?" আমি অপ্রতিভ হইলাম, আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

দুলা-ভাই। চায়ে চিনি দেওয়া হয় নাই।

তাঁহার দিদি বলিলেন, "তাহেরা এ কয়দিন চম্পা-বিরহে অন্যমনস্কা আছে!"

দুলা-ভাই। কি জান, আপা! তাহেরার অন্যমনস্ক হওয়ার কারণ চম্পা-বিরহ, না, আজ ডাকে ব্যারিষ্টার সাহেবের পত্র না পাওয়া—তাহা ঠিক বুঝা যায় না!!

আমি অগত্যা সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলাম। শেষে মন মানিল না, সন্ধ্যায় চম্পাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ও তাহার মাতা আসিল। চম্পাকে পশ্চাতে রাখিয়া তাহার মাতা আসিয়া একেবারে আমার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল,—"চম্পা পিলা মনুষ্য—হু হু হু!" ব্যাপার দেখিয়া আমি ত অবাক; চম্পা ছেলে মানুষ, সেজন্য তাহার মাতা কাঁদে কেন? পরে বুঝিলাম, "হাকিম বাবু" স্বয়ং চম্পার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের বিপদ ও ভয়ের কারণ! লোকগুলি যেমন ভীরু, তেমনই আবার যুক্তি তর্কেরও ধার ধারে না!

* * *

একবার আমি একটি ইংরেজবালাকেও ভাল বাসিয়াছিলাম। তিনি শ্বেতাঙ্গী, আমি কৃষ্ণাঙ্গী—এক কথায় বলি, আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক,—তাঁহাদের বড়দিনের উৎসব সময়টা প্রায় আমাদের মধুর বসন্তের ন্যায়; আমরা বাসন্তী সন্ধ্যায় মুক্ত ছাদে বসিয়া সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বেল যুথিকার পরিমলবাহী মলয়ানিল উপভোগ করিতে ভাল বাসি, আর তাঁহারা পৌষমাসের দুরন্ত শীতে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া অনল উত্তাপ উপভোগ করিতে ভাল বাসেন! তবু আমাদের উভয়ের হৃদয়ে অকপট সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল, মিস্ ডি'ও ইহা স্বীকার করিতেন।

মিস্ ডি'র বিরহে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। তাঁহাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। আমি ওয়েটিংরুমে বসিয়া গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী

শুনিলাম; গাড়ী চলিবার শব্দও শুনিলাম,—তখন মনে হইল যেন ট্রেণখানা আমার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল! তারপর? তারপর,—মিস্ ডি ও আমার মাঝখানে বিশাল সাগরের ব্যবধান রহিয়া গেল।

আবার বলি, এ কেমন প্রেম? আমার দীর্ঘজীবনের সমুদয় প্রেমকাহিনী বলিবার এ স্থান ও কাল নয়—তবে আর একটী মাত্র ঘটনা বলিয়াই উপসংহার করিতেছি।

আমি কয়েক বৎসর স্বামীসহ পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম। অল্পকাল মধ্যেই প্রতিবেশিনী মহিলাবৃন্দের সহিত আমার আলাপ হইল। বিশেষতঃ একজন প্রবীণা মোসলেম ললনাকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করিতাম, তিনিও সুদে আসলে আমার ভালবাসা প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার সহিত এক ধর্ম্ম ব্যতীত অপর অনেক বিষয়ে আমার ঐক্য ছিল না। যথা, তাঁহার জন্মভূমি পশ্চিমে, আমার জন্মভূমি পূর্ব্বে (অর্থাৎ বঙ্গদেশে); তিনি আমা অপেক্ষা বয়সে ত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন, তবু আমরা দুইটি শৈশবসঙ্গিনীর ন্যায় অভিন্নহৃদয় হইয়া উঠিলাম!

পরমেশ্বর মানবের অতি-প্রেম সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং আমার মাননীয়া বন্ধুটী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্তা হইলেন। আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার অবৈতনিক সেবিকা হইলাম। এখন হইতে তাঁহাকে "আমার রোগী" বলিব।

জীবনে এই প্রথমবার (আত্মীয় ব্যতীত অপর) রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, পরের সেবায় এত সুখ শান্তি, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে,—তাই আমারও এ সুখশান্তিটুকু দেখিতে না দেখিতে—প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে না করিতে—ফুরাইয়া গেল।

আমি অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-মুকুল, আতর, গোলাপজল প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি, এবং বেদানা, কমলালেবু ইত্যাদি জড় বস্তুর আকৃতিতে আন্তরিক প্রেম উপহার লইয়া আমার রোগীর নিকট উপস্থিত হইতাম। কিসে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, কোন জিনিষটি তিনি ভাল বাসিবেন, এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার মনোরঞ্জনই যেন আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার রক্তহীন ক্ষীণ অধরে ঈষৎ হাস্য দেখিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না।

আর আমার মানসিক অবস্থা?—সন্ধ্যা হইলেই (আমি প্রত্যহ সায়াহ্নে এবং দিবা ১ ঘটিকার সময় তাঁহার নিকট যাইতাম) তিনি আমার জন্য তাঁহার শয্যার সন্নিকটে আসন প্রস্তুত করাইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। আমাকে দেখিবামাত্র যেন তাঁহার রোগযন্ত্রণা লাঘব হইত! যখন অত্যধিক দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া থাকিতেন, তখনও আমি আসিয়াছি শুনিলে চক্ষু খুলিতেন! সেই জ্যোতিহীন নয়নদ্বয় আনন্দ-কিরণে উজ্জ্বল হইত!

আমার রোগী আব্‌দার করিতেন—ঔষধ খাইবেন না। আমি ঔষধ হস্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার শুষ্ক অধরে হাস্যরেখা প্রকটিত হইত—কপট বিরক্তির সহিত বলিতেন, "আয়িঁ মুঝে সাতানে কো" (আসিলেন আমায় জ্বালাতন করিতে!) কিন্তু ঔষধ তৎক্ষণাৎ সেবন করিতেন। যে পথ্য আর কেহ প্রস্তুত করিলে অখাদ্য হইত, তাহা আমার করস্পর্শে সুস্বাদু হইয়া যাইত! প্রেমের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা!!

আমার রোগী সেই অন্তিম দশায়ও আমাকে দেখিলেই বসিতে অনুরোধ করিতেন; আমি নমস্কার করিলে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। আমি তাঁহাকে যাতনা বেদনা ভুলাইয়া অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য ছোট ছোট গল্প বলিতাম, তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। তিনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন, সেজন্য আমাকে উর্দ্দু গজল (গীতি-কাব্য) গাহিতে হইত। অধিকাংশ গজল তাঁহারই ফরমাইশ অনুসারে পঠিত হইত।

সেদিন আমার রোগীকে দেখিয়া হতাশ হইলাম। তাঁহার আরোগ্য লাভের শেষ আশাটুকু সেই দিন অন্তর্হিত হইল। আমি তাঁহার শর্য্যাপার্শ্বে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম, অদ্য বসন্ত ঋতুর শেষ দিন; এই বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার রোগীও শেষ-বিদায় লইতে চলিলেন! সেই রবি, শশী, তারা সবই থাকে, কেবল বসন্তমাধুরী ফুরায়! মানসকর্ণে কোন কবি ও প্রকৃতির প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলাম,—

(প্রকৃতিরে) সুধাইনু, "কি হ'ল তোমার
সে সৌন্দর্য্য আর সেই (বসন্ত) যৌবন?"
সহাস্যে উত্তর দিল সে, "ও প্রিয়তম!
আমি না ছিলাম, ছিল মহিমা-স্রষ্টার!"

বসন্ত ত আবার আসিবে, আসিবেন না কেবল আমার রোগী!

ঠিক সেই সময় আমার রোগী অনুরোধ করিলেন,—"গোর-চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হ'ল প্রায়—এই গজলটি গাও , তাহেরা!"

আমি বিস্মিত হইলাম; তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন কিরূপে? সে যাহা হউক, এখন রোগীকে কোথায় আশার কথা শুনাইব, না বৈরাগ্যব্যঞ্জক নিরাশার গান গাহিব, বলিব, "(কিছুকাল পরে তোমার) গোরের চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না?" আর যিনি আজ না হয় দু'দিন পরে নিশ্চয় মরিবেন, এরূপ রোগীর পার্শ্বে বসিয়া মৃত্যুগীতি গাওয়াও ত শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ! আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, ওটা খুব কণ্ঠস্থ নাই। তখন তিনি আমার হাতে একখানি গজলের খাতা দিয়া বলিলেন, "তবে—

নাই সেকেন্দর কিম্বা দারার কবর,—
মুছে গেছে মানীদের স্মৃতিচিহ্ন কত!

ইত্যাদি পড়।"

আমি বিপদে পড়িলাম, ঐটাও যে ঐ ধরণের কাব্য। শেষে রোগীর আব্‌দারই রক্ষা করা গেল! যদিও—

"মৃত্যুযন্ত্র কত জনে করেছে পেষণ,
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত?"

আবৃত্তিকালে আমার হৃদয় দ্বিধা হইতেছিল! ভাবিয়াছিলাম এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিবে। কিন্তু না—।

সেদিন বুধবার সন্ধ্যা। আমার রোগী অদ্য আমাকে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন না; আমাকে বসিতেও বলিলেন না; আমি কাতরে ডাকিলাম, সাড়া দিলেন না। এই অনাদরে (?) আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আমার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার কন্যা-বধূরা ধৈর্য্যহারা হইয়া গোল বাধাইবেন, এই ভয়ে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম। ঐ সময় অশ্রু সম্বরণ কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কে বুঝিবে?

আমি তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম, এমন সময় (আমার করস্পর্শে!) তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বহিন্! আজ বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি।" সেই "বহিন্" শব্দটি কেমন প্রাণভরা ভালবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা যে একবার শুনিয়াছে সে আর এ জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রি; আমার রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়াছে। আমি সেই প্রাণহীন হাত দু'খানি গরম করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম,—আমার সম্মুখেই কি করিয়া তাঁহার প্রাণপাখী উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না!

*   *   *

প্রেমের আলোচনা যতই করি, ততই দেখি, উহা দুর্ব্বোধ। প্রেমিক-হৃদয় নবনী সদৃশ কোমল; আবার পাষাণবৎ কঠিন। কখনও দেখি, প্রেম অতিশয় দৃঢ়, কখনও দেখি, ভঙ্গপ্রবণ! ইহা শিশুর হৃদয়ে থাকে, কিশোর-হৃদয়ে থাকে, প্রবীণ-হৃদয়েও থাকে—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। প্রেম কি স্বর্গীয় কোন তরুর মত—আমাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে? অথবা প্রেম কি কোন ভাষার মত মানবের প্রাণে নানা ছন্দে ঝঙ্কারিত হয়? যাহা হউক, বুঝা গেল না, প্রেমের স্বরূপ কি। বুঝিলে এই মাত্র বুঝি, প্রেমের আদি অন্ত নাই—প্রেম-রহস্য দুর্ভেদ্য!

(Mrs.) R. S. Hossein.

ভারত-মহিলা, শ্রাবণ ১৩১৩

"কাটা মুণ্ড কথা কয়"

"বঙ্গলক্ষ্মী"র পাঠিকা ভগিনীগণ জানেন, ভারতের বিবিধ সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে মুসলিম-ললনা কিরূপ পশ্চাৎপদ এবং মৃতপ্রায় নির্জ্জীব। এখন তাঁহারা এ-কথা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মুসলিম-নারীও সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামাজিক কুপ্রথা আমাদের মাথা কাটিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এখন সেই কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত সত্য ঘটনা পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিতেছি।

প্রায় দুইমাস হইতে সংবাদপত্রে প্রচার করা হইতেছিল যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ বার্ষিক জুবিলী উপলক্ষে সভা-সমিতির বিরাট আয়োজন হইতেছে। মুসলিম পর্দানশীন মহিলাদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ পর্দার ব্যবস্থা থাকিবে। ২৬শে ডিসেম্বরে "অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের" অধিবেশন হইবে, এবং ২৮শে তারিখে জুবিলী অধিবেশন হইবে। তদনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম মহিলাগণ আলিগড়ে সমবেত হইয়াছিলেন।

২৬শে ডিসেম্বর বেলা ৯টার সময় যখন সমাগত মহিলাবৃন্দ তত্রত্য বালিকা কলেজের সেক্রেটারী শেখ আবদুল্লাহ্ সাহেবের পত্নীকে সভামণ্ডপে যাওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বিষণ্নমুখে বলিলেন, "হাঁ সব প্রস্তুত; কিন্তু দেখুন না, মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের সেক্রেটারী প্রফেসার শিরওয়ানী কি গোলযোগ করিতেছেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সভামণ্ডপে যাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দিবেন না।" অতঃপর মিসেস্ আবদুল্লাহ্ সকলকে শিরওয়ানীর স্বহস্তলিখিত আদেশ-লিপি দেখাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "এডুকেশন্যাল কন্ফারেন্সের সেক্রেটারীরূপে আমার হুকুম এই যে, মেয়েরা মণ্ডপে আসিতে পাইবেন না। তাঁহারা হুকুম অমান্য করিয়া যদি আসেন, তবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি দায়ী হইব না।"

মহিলাগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব দায়িত্বে বোরকায় (বিশেষ প্রকার অবগুণ্ঠনে) আবৃতা হইয়া যাইবেন। পরে মিসেস আবদুল্লার সহায়তায় বালিকা কলেজের মোটরবাসে আমরা প্রায় ২৫ জন স্ত্রীলোক রওনা হইলাম। আমরা পুলিশ প্রহরীর রেগুলেশন লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বিনা দ্বিধায় সকলে মণ্ডপে গিয়া উঠিলাম। তথায় বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা আতিয়া বেগম সাহেবা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে যথাস্থানে বসাইলেন। আমরা দেখিলাম, চিক এবং কাপড় ঘিরিয়া যে পর্দার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা সব খুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিক ও কাপড়ের পর্দাগুলি পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রোফেসার শিরওয়ানীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল।

মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিলে আতিয়া বেগম সাহেবা ভলান্টিয়ারদের দ্বারা চিকগুলি বাঁধাইয়া দিলেন। কর্ত্তৃগণ আতিয়া বেগমকে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। আর আতিয়া বেগম রাগে কাঁপিতেছিলেন।

যথাসময়ে আতিয়া বেগম একটা চেয়ারে দাঁড়াইয়া দুই চিকের ফাঁক হইতে মুখ বাড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; তখন সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী ফিরিয়া বসিলেন। অনেকে চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়া চিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রোফেসার শিরওয়ানী বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। পরে আতিয়া বেগম প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া প্রায় ১০ মিনিট বক্তৃতা করিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর জুবিলী অধিবেশন ছিল; সে দিন মহিলাগণ বিনা বাধায় মণ্ডপে গিয়াছিলেন। যথাবিধি চিক পর্দার ব্যবস্থা ছিল। সে দিন আতিয়া বেগম আমাদের নিকট না বসিয়া প্লাটফরমের পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদের বক্তৃতায় টিট্‌কারী দিতেছিলেন। একবার তিনি বলিলেন, "যে ভদ্রলোক মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন, তিনি চুড়ি পরিয়া অন্তঃপুরে বসুন।" চিকের অন্তরাল হইতে জনৈক মহিলা দুইগাছি চুড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রকারে পর্দানশীন নির্জ্জীব মুসলিম মহিলাগণ রণাঙ্গন হইতে প্রোফেসার শিরওয়ানীকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্ব্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং দেখিলেন, ভগিনি! এখন কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব "বঙ্গ-লক্ষ্মী"র জয়।[৭]

(মিসেস্) আর. এস. হোসেন

বঙ্গলক্ষ্মী, মাঘ ১৩৩২

গুলিস্তাঁ

কোরান-শরিফে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন,—

"ফাঁদ খলিফি ইবাদী ওয়দ খুলিফি জান্নাতি"

অর্থাৎ—"অতএব আমার বাগানের মধ্যে আইস এবং আমার বাগানে প্রবেশ কর।"

মানবের চরম লক্ষ্য সেই গুলিস্তাঁ—যাহা আল্লাহ্‌ পুণ্যাত্মাদিগকে দান করিবেন—যেই গুলিস্তাঁয় প্রবেশ করিতে আল্লাহ্‌ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

আমরা তুচ্ছ মানব সামান্য লতা-পাতা লইয়া গুলিস্তাঁ রচনা করিয়া থাকি; কারণ ফুলের মত সুন্দর, ফুলের মত নির্ম্মল এবং ফুলের মত পবিত্র জিনিষ জগতে আর কিছু নাই। কত কবি কত ছন্দে যে ফুলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাস্তবিকই ফুলের সুষমা, ফুলের সৌরভ এবং সৌন্দর্য্য মানুষকে যত আনন্দ দেয়, আত্মহারা করে, তেমন আর কিছুতে পারে না। এ জ্বালা-যন্ত্রণাময় জগতে যদি কিছু জুড়াইবার জিনিষ থাকে, তবে সে একমাত্র ফুলকেই বলা যায়।

সৃষ্টিকর্ত্তার কি অপার মহিমা! তিনি মাটী ও ধূলা হইতেই ফুল উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যতই পাপিষ্ঠ হই না কেন, অনুতপ্ত চিত্তে তওবা করিলে আমাদের সমস্ত কলুষ ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে, আমাদের মন পবিত্র ফুলের মত হইবে। পাপ, পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আমরা ফুল হইতে পারিব। ফুল হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু পৃথিবীতে আছে কি? ফুল অমূল্য ধন। আমেরিকার একটী গোলাব ফুলের মূল্য সময় সময় ২৫০্‌ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকার লোক জানে ফুল কি জিনিষ। আমাদের দেশে প্রকৃতির দয়ায় ফুলের অভাব নাই; তবু গোলাবের মত সুন্দর ফুল বনে-জঙ্গলে হয় না।

ফুল না হলে আমাদের চলে না; জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত শুভকর্ম্মে ফুল ব্যবহৃত হয়। নববধূকে ফুলের অলঙ্কার পরাই; ফুলদ্বারা বিবাহের মজলিস্‌ সাজাই। ফুল

প্রিয়জনকে উপহার দেই। ফুল দ্বারা আর আর কত কি হয় তাহা বর্ণনাতীত। জীবনের শেষ ক্রিয়া শবাধার ফুল দ্বারাই সজ্জিত হয়। অতএব আমরা গুলের সৃষ্টিকর্ত্তাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে "গুলিস্তাঁ" পত্রিকাকে এস্তেকবাল্ করিতেছি।

(মিসেস্) আর এস. হোসেন

গুলিস্তাঁ, পৌষ ১৩৩৯

কৌতুক-কণা

(১)

প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে হিপোপটেমাস্ জন্তুর বিষয় বুঝাইবার সময় বলিলেন,—"হিপোপটেমাস্ কেমন কুৎসিত জন্তু তাহা যদি ভাল মতে বুঝিতে চাও, তবে আমার মুখের দিকে তাকাও।"

(২)

এক আফিংচি ছেলে কোলে লইয়া মেলায় গিয়াছিল; অনেকক্ষণ নানা দৃশ্য দেখার পর তাহার মনে হইল ছেলে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বেচারা ছেলে খুঁজিয়া হয়রাণ। শেষে থানায় সংবাদ দিয়া বাড়ী ফিরিল। ঘরে প্রবেশের সময় কপাটের আঘাত লাগায় তাহার কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। তখন সে ছেলের গালে চড় মারিয়া বলিল—"কম্‌বখ্‌ৎ! আগে কাঁদিস্‌নি কেন? তা' হ'লে আমার এত হয়রাণ হয়ে থানায় খবর দিতে হত না।"

(৩)

হরিশবাবু চাকরের হাতে একটা চিঠি আর পাঁচটা পয়সা দিয়া বলিলেন যে, সে যেন টিকিট কিনিয়া চিঠিতে আঁটিয়া চিঠিখানা ডাকে দেয়। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া হাসিমুখে পয়সা ফেরত দিয়া বলিল,—"নিন আপনার পয়সা। যেই দেখলুম ডাকবাবু মাথা নীচু করে লেখাপড়া করছেন, আমি অম্‌নি চুপি চুপি চিঠিখানা ডাক-বাক্সে ফেলেই, দিয়েছি দৌড়! দেখুন ত কি বুদ্ধি করে বিনি পয়সায় আপনার চিঠি ডাকে দিয়ে এলুম, তবু আপনি আমায় বোকা বলেন!"

(৪)

পাদ্রী সাহেব মিশন স্কুলের ছাত্রদিগকে পাঠ শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভবিষ্যতে তোমরা কে কি হতে চাও?" জনৈক ছাত্র বলিল,—"আমি কৃষক হব।" পাদ্রী সাহেব

সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বেশ ভাল কথা। তুমি মানবের ক্ষুধা নিবারণের উপায় করবে। লোকের পরম উপকার করবে।"

অপর একজন বলিল, "আমি শিক্ষক হব।" পাদ্রী সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"এ তো আরও ভাল; তুমি মানবের মানসিক ক্ষুধা নিবারণ করবে। শারীরিক খাদ্যের চেয়ে মানসিক খাদ্যের মূল্য বেশী।"

তৃতীয় ছাত্র বলিল,—"আমি পাদ্রী হব।" এবার পাদ্রী সাহেব আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"বেশ, বেশ, তুমি মানবের পরিত্রাণের কারণ হবে। শারীরিক ও মানসিক খাদ্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক খাদ্য আরও শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা বাপু! বল ত তুমি কেন পাদ্রী হতে চাও?"

ছাত্র বলিল, "আমরা গরীব বলে মাংস খেতে পাই না। কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ী যেদিন যান, সে-দিনই আমার মা মুর্গী রেঁধে আপনাকে খাওয়ান।"

(৫)

এক বাড়ীতে বিবাহ হইতেছিল। যে মোল্লা বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তোতলা; আর বর ছিল বধির। মোল্লা সাহেব বহু কষ্টে বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ব-ব-বল, বি-বি-বি-ই-ইঃ-ঈ-স্‌মিল্লাহ্—", বর জিজ্ঞাসা করিল, "অ্যাঁ?" মোল্লা ভারী বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন, আমি এত কষ্ট করিয়া বিস্‌মিল্লাহ্ বলিলাম, ও হতভাগা তাহা শুনিতেই পাইল না!

(৬)

একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভূগোল পড়াইবার সময় দিক-নির্ণয় বুঝাইতেছিলেন। তিনি একটী ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ, তোমার বাম হাত দক্ষিণ দিকে, ডান হাত উত্তরে, মুখ পশ্চিম দিকে, এখন বল ত তোমার পশ্চাতে কি আছে?" সে উত্তর দিল, "স্কুলে আসবার সময় মা আমার ছেঁড়া প্যাৎলুনে একটা তালি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাই আছে।"

(৭)

দুইটী ছোট বালিকা পুতুলের বিবাহ দিতেছিল। তাহাদের একজন বরের মা এবং একজন ক'নের মা সাজিয়াছিল। বিবাহের মন্ত্র পড়াইবার সময় মোল্লাজী বরের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। বরের মা উত্তরে বলিয়া পাঠাইল যে, বল উহার মায়ের এখনও বিবাহ হয় নাই।

স্বর্গীয়া মিসেস্ আর্. এস. হোসেন

গুলিস্তাঁ, মাঘ ১৩৩৯

পরিশিষ্ট

মতীচূর-সমালোচনা।

বাঙ্গালা ভাষা এখন আর নিতান্ত দীনা নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখন জাতীয়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কোন জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-পক্ষে কবিতা এবং উপন্যাসের বাহুল্য অনাবশ্যক না হইলেও গুরু সন্দর্ভাদি দ্বারাই সাহিত্যে দৃঢ়তা, গুরুত্ব এবং শক্তি সঞ্চারিত হয়। গুরু সন্দর্ভ সাহিত্য-শক্তির পরিচয় দেয় এবং তাহাকে উদ্বোধিত করে; সুতরাং গভীর গবেষণা, ভাব এবং চিন্তাপ্রসূত নানা বিষয়ক সন্দর্ভ যত প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

মাসিক-সাহিত্য-পত্রই এবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ত্রিপাদ পাঠকের কাছেই এসকল সন্দর্ভ অপঠিত থাকে। ইহা সাহিত্যের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকর এবং পাঠকের পক্ষে উন্নতি-প্রয়াসহীন তরলতার পরিচায়ক,—নিতান্তই লজ্জার বিষয়। এই জন্যই বাঙ্গালায় সন্দর্ভগ্রন্থের প্রচার এত বিরল,—সন্দর্ভগ্রন্থ-লেখক ও লেখিকাও এত অল্প।

আজিকালি তবু দুই-একখানি প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকের মধ্যেও সন্দর্ভ পাঠাকাঙ্ক্ষা দেখা গিয়াছে। অধুনা বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, রামদাস প্রভৃতির আদর্শে মাসিকের অকর্ত্তিত পত্রমধ্য হইতে সন্দর্ভমালা গ্রন্থাকারে বাহির হইতেছে এবং পাঠক সমাজকে আন্দোলিত করিতেছে। ইহা শুভলক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু, গ্রন্থকারদিগের অনুকরণে গ্রন্থকর্ত্রীগণ যে কবিতা-স্রোতে গা ঢালিয়াছিলেন, এখনও তাঁহারা তাহা হইতে একেবারে উঠিতে পারেন নাই। উন্নত-শিক্ষাসম্পন্না মহিলাগণের লেখনী আজও কমকান্ত প্রসূনরাজি-বিশোভিত সুরভি-মধুর মলয়ানিল সন্ধুক্ষিত পিককলমুখরিত মোহন কাব্যকুঞ্জের সৃষ্টি প্রয়াসে সযত্ন নিরত। তাঁহাদের সাহিত্যপাঠ স্পৃহাও সেই কল্পনাজালাবৃত কুঞ্জমধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ইহা প্রকৃত পথ নহে। এই লেখনী যে দিন প্রকৃত সুগৃহিণীর কর্ত্তব্যচিত্র অঙ্কনোদ্দেশে গণ্ডী ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবে, আর এই তৃষ্ণা ঐরূপ চিত্র দর্শনে ব্যাকুল হইবে, সেইদিন বাঙ্গালাভাষার পক্ষে শুভদিন।

'মতীচুর' এইরূপ একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ।[৮] সন্দর্ভ-গ্রন্থ, সন্দর্ভ-বিষয় এবং সন্দর্ভ-রচয়িত্রী প্রভৃতি বিবিধ হিসাবে 'মতীচুরে'র মূল্য এসময়ে বড় বেশী। এত বেশী মূল্য বলিয়াই আমরা এ সম্বন্ধে দুই কথা বলিতে বসিয়াছি।

'মতীচুরে'র বহিরাবরণ অতিশয় সুদর্শন,—পরম লোভনীয়। এরূপ আবরণ খুলিয়া আজিকালি অনেকেই স্থূল-চিক্কণ পত্রে দুই-চারি পংক্তি সিপিয়াকালীমুদ্রিত 'আসি তবে' 'যাই তবে' ধরণের কবিতা কিংবা গল্পগুচ্ছ দেখিবার আশা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নৈরাশ্যে আমরা ক্ষুণ্ণ হইব না। যে সাহিত্যে সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগের সমস্যাপূর্ণ বিষয় লইয়া স্বয়ং মহিলাগণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেছেন, সে সাহিত্য বাস্তবিকই পরিপূর্ণতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিশোরী বঙ্গভাষার পক্ষে ইহা বড়ই আশাপ্রদ,—পরম আনন্দ পুলক-কর।

বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িত্রী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা। অধিকন্তু, আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূলতার মধ্যেও হৃদয়ের অদম্য তৃষায়, কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঐকান্তিক সাহায্যে, যে জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানপ্রসূত এ অমূল্য রত্ন তিনি আমাদিগের সাহিত্যভাণ্ডারে উপহার দিয়াছেন। ধন্য লেখিকা, ধন্য এ সাহিত্য, আর ধন্য সেই ভ্রাতা। এ 'মতীচুর' সাহিত্য-পূজায় অকৃত্রিম অনুরাগ-চর্চ্চিত প্রকৃত ভক্তিপূত ফুল্লপুষ্পাঞ্জলি। —এ একলব্যের প্রাণব্যাকুল পূজার অমূল্য অতুল গুরু দক্ষিণা।

হিন্দু-মুসলমান আজি একত্রে বাঙ্গালাভাষার উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত,—মাতৃভাষার পূর্ণমাতৃত্ব এবং জাতীয় শক্তির দৃঢ়তা আজি নব বলে জাগিয়া উঠিতেছে, এই বলিয়া আমরা কতই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু, যেমন হিন্দুর, তেমনই মুসলমানের অন্তঃপুর মধ্যেও আমাদের এই মাতৃ ভাষা এতখানি আদর পাইতেছে,—এতদূর যত্ন চর্চ্চায়,—এত সুন্দর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে চন্দন-চর্চ্চিত উপহারের মত উপস্থিত হইয়াছে,—আজি এ অসীম আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। কেবল এই জন্যই বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে এ শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ 'মতীচুর' অমূল্য রত্নখণ্ড।

'মতীচুর' সত্যই মতীচুর। ইহার লিখনভঙ্গী যেমন বিস্ময়কর, ভাষাও তেমনি মনোহারিণী। এই চমৎকার লিপি কৌশল ও মনোহারিণী ভাষার মধ্যে যে গভীর ভাবরাশি উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক পাঠকের নিকট তাহা অনন্ত চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই উপাদেয় গ্রন্থ "মোহরের পায়েসে"র ন্যায় পাঠকের পাঠ-ক্ষুধার উদ্রেক করে, কিন্তু ইহার স্বাদ লইতে গেলে আনন্দ পুলকের সঙ্গে সঙ্গে অশেষ চিন্তা এবং অপার সমস্যা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

'মতীচুর' পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' এবং কালীপ্রসন্নের 'ভ্রান্তিবিনোদ' মনে পড়ে।[৯] অতুল কাব্যালঙ্কারে, বিপুল রহস্য বিজড়িত রসপূর্ণ যে সুগভীর সমস্যা—প্রশ্ন সমুচ্চয়ে কমলাকান্তাদির উৎপত্তি হইয়াছিল, 'মতীচুর'ও সেইরূপ

অগণ্য সমস্যা-ভাব আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। পার্থক্য কেবল, তাহাদের মূল প্রধানতঃ দর্শনে; ইহার ভিত্তি সমাজ-সমস্যার উপরে। 'মতীচূরে'র ন্যায় গ্রন্থের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। সুতরাং ইহার গুরুত্বও সামান্য নহে। 'মতীচূর' শুধু হিন্দু-মোস্‌লেম সমাজকে নহে, সর্ব্বশ্রেণীর পাঠককে—ভাবতরঙ্গে আলোড়িত করিয়াছে। মুসলমান মহিলা লিখিত সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থের এ ক্ষমতা কতদূর বিস্ময়কর, তাহা ভাষায় বুঝান সুকঠিন।

'পিপাসা', 'আমাদের অবনতি', 'নিরীহ বাঙ্গালী', 'অর্দ্ধাঙ্গী', 'সুগৃহিণী', 'বোরকা' এবং 'গৃহ' এই সপ্তসন্দর্ভ-মুক্তা-কণিকায় 'মতীচূর' গঠিত। এই মুক্তাসপ্তক ত্রিবর্ণে বিভক্ত। প্রথমে 'পিপাসা', দ্বিতীয়ে 'নিরীহ বাঙ্গালী' এবং অবশিষ্ট পঞ্চমুক্তা তৃতীয় শ্রেণীর। এই শেষোক্ত পঞ্চমুক্তা সমস্যা সমুদ্রের অতি গভীর তলদেশ হইতে উত্তোলিত হইয়াছে।

'পিপাসা' গদ্য কাব্যের নিপুণ তুলিকাচিত্রিত এক সুকরুণ ছবি। সমস্ত বিশ্বজগতের পিপাসা ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে; কিন্তু প্রাণের পিপাসা ধূলায় লুটাইয়া "পিপাসা, পিপাসা" বলিয়া আর্ত্তরোদনে সমস্ত সংসার কাঁদাইয়াছে!

"পিপাসা"র ধ্বনিতে অন্তরের পিপাসা জাগ্রত হয়; কিন্তু সে উধাও পিপাসা কারুণ্যশরাহত হইয়া যখন পিপাসু বিশ্বের বুকে ফিরিয়া আসে, তখন নয়নের অজস্র জলধারাও আর সে পিপাসা নিবাইতে পারে না।

"পিপাসা"র প্রতি অক্ষরে পিপাসার হাহাকার—প্রতিছত্রে পিপাসার ব্যাকুলতা। ভাব স্রোতে ছন্দতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে—স্নেহ বিধুরা। অনন্ত স্নেহময়ী জননীর আকুল স্নেহ-পিপাসা, বণক্লান্ত বিপুল জনসঙ্ঘের দারুণ জলপিপাসা, আর সংহারোন্মুখ অস্ত্র-কণ্টকিত ভয়াল মরুভূর করাল শোণিতপিপাসা—পিপাসার এক মহাসংঘর্ষ তুলিকার রেখায়-রেখায় স্পষ্টীকৃত।

"নবপ্রভায়" যে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম—মহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া, জলপ্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন,—'আমি বিদেশী পথিক, তোমাদের অতিথি; আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর,—সহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ শিশু তোমাদের নিকট কোন দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—একবিন্দু জল দাও! ইহাতে তোমাদের দয়াধর্ম্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না!' শত্রুগণ কহিল, 'বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।' বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্ত্তে তীরবৃষ্টি হইল!

'পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু
বজর পড়িয়া গেল।'

হোসেন শরবিদ্ধ আসগরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন, "আসগর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে! আর জল জল বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না!—আর বলিবে না

'পিপাসা, পিপাসা!' এই শেষ!"—সেদিন* মহরমের 'মর্সীয়া'র হৃদয়-বিদারণ আর্ত্তকরুণ সুর এবং 'হায় হোসেন, হায় হোসেন!!' ধ্বনির সহিত ব্যাকুল শোকস্মৃতি, উন্মাদ-ভাবে বক্ষে করাঘাত,—এ সকল চক্ষুর সম্মুখ দিয়া, কর্ণের মধ্য দিয়া হৃদয় ভেদ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সেই দিন যে আকুল পিপাসায় হৃদয় হা হা করিয়া উঠিয়াছিল, আজ 'পিপাসা' পড়িয়া আবার তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি ছবি, "হৃদয়ানন্দ জানিত—আমি তাহাকে জল দিব না। আমি ডাক্তারের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত সময়ে জল চাহিতে সাহস করে নাই! কি মহতী সহিষ্ণুতা! জলের পরিবর্ত্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, যে চা'র পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না—পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটী দুই হস্তে (যেন কত আদরের সহিত) জড়াইয়া ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল! আহা! না জানি সে কেমন পিপাসা! অনলরচিত পিপাসা কিম্বা গরলরচিত পিপাসা!! ... আক্ষেপ এই যে জল কেন দিলাম না? রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না—রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না? এই জন্যই ত রাত্রিদিন শুনি "পিপাসা, পিপাসা!", এই জন্যই ত এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি,—অন্ধকারে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে লেখা—"পিপাসা, পিপাসা!"—ব্যথিত মর্ম্মের উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া এ পিপাসা যে শতগুণে বাড়িয়া উঠে!—বাষ্প-আবেগে নয়নের সমক্ষে এ চিত্রের দৃশ্য রুদ্ধ হইয়া যায়, অন্তর না জানি কোন্ নিদারুণ পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে!

বুঝি জননীর জাতি বলিয়াই তিনি এ পিপাসার এমন দৃশ্য এমনি করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন;—এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইয়াছেন!

যে লেখনী হইতে এ 'পিপাসা' সৃষ্ট হইয়াছে, সে লেখনী ধন্য। যে আকুল হৃদয় হইতে এ পিপাসার আর্ত্তনাদ উৎসারিত হইয়াছে, সে হৃদয়ের তুলনা নাই। কিন্তু অতি আশ্চর্য্য সেই লেখিকার লেখনীর শক্তি; যিনি দারুণ সন্তানশোক হৃদয়ে লুকাইয়া চোখের জল শুকাইতে না শুকাইতে অনাবিল রহস্যের সঙ্গে গুরুতর সমস্যা লইয়া হিতাকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারেন। কর্ত্তব্য-কঠোর সংসারে কুসুমকোমল প্রাণ এমনই করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে বজ্র কঠিন হয়। হয়, কর্ত্তব্যের পরীক্ষায়, নয় হৃদয়ের আবেগে। এখানে ভাণ নাই; ইহাই সংসারের খাঁটি সত্য। 'নিরীহ বাঙ্গালী' রস ও রহস্যের আবরণে কি তীব্র ধিক্কার, কি মর্ম্মন্তুদ চিত্র! এ চিত্রে লোকরহস্যাদি বহু গ্রন্থের ভাবরাশি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। —হউক সে নবীকৃত পুরাতন কথা;—কিন্তু, বঙ্কিমপ্রমুখ মহাত্মার মধুমাখা কশাঘাতে যাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, আজ অন্তঃপুরের

* মুর্শিদাবাদে

সুবর্ণসম্মার্জ্জনী তাহাদের চৈতন্যসঞ্চারে উদ্যত,—আজ যদি চেতনা হয়! অন্তঃপুরের এ মিষ্ট টিট্‌কারী রুগ্ন সমাজে হয়ত মহৌষধিস্বরূপ হইতে পারে! আজ ভারতললনা স্বয়ং জাগিয়া উঠিয়া সম্মার্জ্জনী ধরিয়াছেন, এখনও যদি জঞ্জাল-আবর্জ্জনা দূরীভূত হইবার আভাষ না পাওয়া যায়, তবে বাঙ্গালীর ঘুম আর ভাঙ্গিবে না। ---এ নিদ্রা নিদ্রা নহে, মৃত্যু।

অবশিষ্ট পঞ্চ প্রবন্ধে, গ্রন্থকর্ত্রী ব ́মান মৃত সমাজ সম্বন্ধেই অনেকগুলি কথা কহিয়াছেন। যে সকল গুরুতর সমস্যা লইয়া আন্দোলন, সংক্ষেপেও তাহার সকলগুলির মীমাংসা করা সহজ নহে। সকল প্রবন্ধের বিষয়গুলির সামঞ্জস্য করিতে গেলে বহুবার প্রয়াস করিতে হয়। কিন্তু আমাদের ধারণা তাহাতেও তাঁহার সকল কথার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব এই এক প্রবন্ধে সে সমস্তের সম্পূর্ণ সমালোচনা করা অসম্ভব হইলেও এ গ্রন্থে তাঁহার যে ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার কথা সাধারণ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। সত্য, তিনি 'স্বকীয় মত মাত্র' ব্যক্ত করিয়াছেন: কিন্তু তাঁহার ন্যায় লেখিকার মতের মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। বিশেষতঃ তাঁহার এই 'স্বকীয় মতে' সমাজে যে আন্দোলনের সম্ভাবনা, তাহা কখনই উপেক্ষনীয় নহে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু বলিতে হইবে।

সমস্যা বা অভিমতি সকলের সংখ্যা বহু। তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা একান্ত প্রধান কয়েকটি বিষয় লইয়াই মীমাংসার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান সমাজের ক্ষত সম্বন্ধে তিনি অনেক চিত্র দেখাইয়াছেন। চিত্রের দৃশ্য বস্তুতঃই ভীষণ মর্ম্মপীড়ক। এ সকলের সংস্কার যে অত্যাবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবেন? শুধু এ সকলের নহে, সমগ্র সমাজেরই সংস্কার আবশ্যক। "বর্ত্তমান মৃত সমাজ" উল্লেখেই আমরা ইহার আভাষ দিয়াছি। সংস্কার আবশ্যক; কিন্তু সংস্কার এক কথা আর সমাজের প্রাকৃতিক বিধি আর-এক বিষয়।

উপযুক্ত সংস্কারে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না,—কিন্তু মূল সমাজবিধির পরিবর্ত্তন কি সম্ভবপর না স্বভাবসম্মত? যাহা একান্ত কৃত্রিম, তাহার পরিবর্ত্তন চলে; পরন্তু প্রকৃতির সহিত যাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাহার পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক ও অমঙ্গলকর হয়। যেমন, ক্ষত জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন; এজন্য রোগীর কোন অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিতে হইলেও করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া হাত কাটিয়া মাথার স্থানে, মাথা পায়ের স্থানে এবং পা হাতের স্থানে বসাইয়া দিয়া রোগীকে কোন উপায়ে আরোগ্য করিয়া তুলিলে বিশেষ লাভ দেখা যায় না।

হৃদয়ের জ্বালাময় আবেগে গ্রন্থকর্ত্রী এ শেষ পঞ্চ প্রবন্ধে অনেক রকমের কথাই কহিয়াছেন। স্থূল বক্তব্য যাহা, তিনি আমাদিগকে ইহা অপেক্ষা অনেক সহজে বুঝাইতে পারিতেন। এক্ষেত্রে যেন হৃদয়ের আবেগেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন;—সকল বস্তু বাছিয়া লইবার অবসর পান নাই। 'পিপাসা' ও 'নিরীহ বাঙ্গালী'তে তাঁহার যে

প্রতিভা নির্ম্মলোজ্জ্বল-জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এ কয় প্রবন্ধে তাহা সর্ব্বগ্রাসিনীরূপে সদসৎ সমস্ত গ্রাস করিয়া বসিয়াছে! এই জন্য অধিক আবেগে—অত্যধিক ব্যগ্রতায় প্রবন্ধগুলি কূটতর্ক এবং নানারূপ সমস্যায় একান্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কোহিনূর, বৈশাখ ১৩১৩

২

তিনি বলিয়াছেন—"আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি; তাঁহাদের ধর্ম্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। ... আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। ... মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেমন সুদূর ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, সেইরূপ অন্তঃপুরে থাকিয়া ললনাকুলও ইচ্ছা করিলে অনেক মহৎকার্য্য করিতে পারেন।" এ ত বেশ কথা। সমাজবন্ধন ঠিক রাখিয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে যেরূপ উন্নতি উপযুক্ত, তাহাতে তাঁহাদের ন্যায্য দাবী আছে। সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকিলে সেরূপ সমাজের সংস্কার অবশ্যই করণীয়; কিন্তু গ্রন্থের সকল স্থলে ত ঠিক এরূপ ভাব বুঝা যায় না। "পুরুষের স্বামিত্ব স্বীকার না করিলেই ত পুরুষের সমকক্ষতা হয়," "কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও,—নিজের অন্ন বস্ত্র উপার্জ্জন করুক," —এরূপ কথায় কি সমাজবন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ভাব বুঝায়? যাহা বুঝায়, তাহাতে এই বুঝি যে, গ্রন্থকর্ত্রীর মূলমন্ত্র স্ত্রী-স্বাধীনতা।

স্ত্রী-স্বাধীনতা; কিন্তু এ স্বাধীনতার একটা প্রকার আছে। স্ত্রী এবং পুরুষ জন্ম সময়ে কেহ কাহারও অধীন হইয়া আইসে নাই; তবে কেন মানব-সমাজে স্ত্রীজাতি সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের অধীন হইয়া রহিয়াছে? আর তাঁহারা পুরুষের অধীন হইয়া থাকিবেন না! "অতএব জাগ, জাগ লো ভগিনি!" এইবার তাঁহারা জাগিবেন! ইহাই এ স্বাধীনতার প্রকার; কিন্তু এ প্রকার সাম্য, এ প্রকার স্বাধীনজাগরণ যে অস্বাভাবিক, আমরা নিম্নে তাহাই বুঝাইতেছি। —

স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম এই দ্বিবিধ ভাবে প্রশ্নগুলির মীমাংসা চেষ্টা করিতে হইবে। স্বভাবতঃ দেখা যায়, স্ত্রী এবং পুরুষ জন্মকালে কতক সমান হইলেও পরিপূর্ণতার পথে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, শারীরিক বলে স্ত্রী ততই পুরুষাপেক্ষা হীনাবস্থায় দাঁড়ায়। যদি বলা যায়, সমাজবিধিবশে বলচর্চ্চার অভাবে স্ত্রী পুরুষাপেক্ষা হীনবল হয়; কিন্তু প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল জীব গঠিত হয়, তাহাদেরও স্ত্রী পুরুষ-তুলনায় দুর্ব্বলা হয়। গো, অশ্ব, হস্তী, মেষ প্রভৃতি পশু এবং গারো, কুকী, সাঁওতাল প্রভৃতি মনুষ্যশ্রেণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। বেহার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল হীন শ্রেণীস্থ মনুষ্যেরা স্ত্রী-পুরুষে সমভাবে কায়িক পরিশ্রম

করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তাহাদেরও পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অধিক বলবান্। য়ুরোপ ও আমেরিকার আদর্শে অনেকে স্ত্রী স্বাধীনতা চাহেন। আচ্ছা, তত্তদ্দেশের স্ত্রী কি পুরুষের সমান শক্তিসম্পন্না? সুতরাং দেখা যায়, পুরুষ-অপেক্ষা স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই দুর্ব্বলা। অতএব শারীরিক শক্তি বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষে সমতা কল্পনা করিলেও সত্যতায় ইহা অসম্ভব, স্ত্রীর প্রকৃতিই যে এ সাম্য-বিষয়ে তাঁহার প্রধান প্রতিকূল।

যদি স্ত্রী ও পুরুষে শারীরিক শক্তি-বিষয়ে বিষমতা থাকিল, তাহা হইলে উভয়ের কার্য্যও ঠিক সমান হইতে পারে না।

তবে জ্ঞানের কথা। সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষে এ বিষয়ে কোন পার্থক্য দেখা যায় না; কিন্তু সময় পুরুষের যতটা আয়ত্ত, নানাকারণে স্ত্রীর ততটা নহে। কাজেই আদিকাল হইতে উভয়ে সমানভাবে জ্ঞানালোচনায় রত হইয়া থাকিলেও সময়ের ব্যতিক্রমে স্ত্রী স্বভাবতঃই পশ্চাতে পড়িবেন। অতএব এ পথেও স্ত্রী একমাত্র স্বভাবের নিয়মেই পুরুষের মুখাপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আর একটা প্রশ্ন আছে, পুরুষের সমান শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়াই স্ত্রীর জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। ভাল, শিক্ষা কি? যাহার যে কর্ম্ম, সে সেইরূপ কর্ম্মে যাহাতে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, এবম্বিধ জ্ঞান-বিধানের নামই ত শিক্ষা? স্ত্রী এবং পুরুষের কর্ম্ম যদি সমান না হইল, তবে শিক্ষার সাম্য কিরূপে সম্ভব?

বিশেষতঃ জ্ঞানের দুইটা আকৃতি রহিয়াছে—জ্ঞান এবং বিশ্বাস। জ্ঞান অতি পরিশ্রম সাপেক্ষ, বিশ্বাস সহজে অবলম্বনীয়। কারণ জ্ঞান নিয়ত পরীক্ষার বিষয়ীভূত, বিশ্বাস তাহা নহে। এই জন্যই প্রধানতঃ পুরুষ জ্ঞান অর্জ্জন করেন, স্ত্রী তাহাতে বিশ্বাস করেন। কতকে জ্ঞান অর্জ্জন করিবে, কতকে তাহা বিশ্বাস করিবে, —ইহাই রীতি এবং স্বভাব। নতুবা প্রত্যেক মানুষকে পরীক্ষা করিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে সংসার অচল হইত। পুরুষ জাতিগতভাবে কঠিন জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন এবং স্ত্রী সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে নানা-দিক্ দিয়া সমাজ সুশৃঙ্খল হইয়াছে।

প্রকৃতির বৈষম্য স্বাভাবিক; স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যও স্বভাবজ। অধিকন্তু স্ত্রী জ্ঞান-বলে সর্ব্বকালে পুরুষাপেক্ষা স্বভাবতঃই যেমন ভিন্ন-শক্তি, তেমনই হীন-শক্তি। গ্রন্থরচয়িত্রী বলেন, স্ত্রীজাতি হীন-শক্তি হইয়াছেন 'আলস্যের দোষে'।* ভাল, সমগ্র সংসারের স্ত্রীজাতি কি একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া আলস্যাভিভূতা হইয়া বসিয়াছিলেন? নতুবা সেই অতি-আদি-যুগে স্ত্রী-পুরুষ যদি সমান শক্তি লইয়া, সম-অবস্থাতেই সৃষ্ট হইয়াছিল, তবে স্ত্রী

---

* বাস্তবিক আলস্যের দোষে নহে। এক শারীরিক দুর্ব্বলতা, দ্বিতীয়তঃ অন্তরের বিশিষ্টতায় এরূপ হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই?" থাকিবে না কেন? সবই আছে। এবং স্নেহ, দয়া, হ্রী, ধৈর্য্য ও প্রণয়াদি কতকগুলি স্বাভাবিক বৃত্তি পুরুষাপেক্ষা অনেক বেশীগুণে আপনাদের আছে। এই সকলের আধিক্যদোষেই ত স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন করিয়াছে। ঐ সকল বৃত্তির প্রত্যেকটিই যে মানুষকে আত্মহিতে উদাসীন এবং পরের অধীন করিয়া দেয়। (লেখক।)

পুরুষের অধীনা না হইয়া, পুরুষ স্ত্রীর অধীন হইল না কেন? আর যদি তাহাই না হইয়াছে, এত যুগের পর এত যুগের সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম কি সম্ভবপর? — না একদিনে সমগ্র সংসারের রমণী জাগিয়া উঠিয়া এ বিধি-শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিয়া স্বাধীন হইলে সে স্বাধীনতা দুই দিনের অধিক স্থায়ী হইবে? 'আলস্য' ঘুচাইলেও স্বাভাবিক নিয়মেই স্ত্রীকে আবার পুরুষেরই অধীন হইতে হইবে!

তবে "পুরুষ স্ত্রীর 'স্বামী' আর স্ত্রী পুরুষের 'দাসী' হইল কেন" এবং "পুরুষ 'প্রেমদাস' না হইয়া 'স্বামী' হইল কেন" এই যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সে স্বতন্ত্র কথা। স্বভাব ইহার প্রথম কারণ হইলেও কৃত্রিমতা ইহার প্রধান কারণ। সভ্যতা, —যাহার জন্য সমগ্র সংসার লালায়িত, তাহা কৃত্রিম। স্বাভাবিক অসভ্যাবস্থা হইতে কৃত্রিম উপায়ে সমাজ-নিয়মের সৃষ্টি করিয়া মানবজাতি সভ্য এবং শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। স্বভাবের নিয়মে স্ত্রী যে বয়সে গর্ভধারণের ক্ষমতা পান, পুরুষ কিঞ্চিন্ন্যূন প্রায় তাহার দ্বিগুণ বয়সে সন্তানোৎপাদনক্ষম হইয়া থাকেন। এই হেতু সভ্য সমাজ কৃত্রিম বিধানদ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে বয়ঃকনীয়সী স্ত্রী এবং গরীয়ান্ পুরুষে বিবাহানুষ্ঠান বিহিত করিয়াছেন।* এই বয়সাধিক্য—সুতরাং জ্ঞান-মান-বলাধিক্য হেতু পুরুষ স্ত্রীর নিকট স্বামীরূপ সম্মান্য অভিধান পাইয়া থাকেন। ইহাতে স্ত্রীর ক্ষুণ্ণ হইবার কোনই কারণ নাই; —বরং এজন্য সমুচিত বিনয়ে তাঁহার চরিত্র সমধিক সুভূষিতই হয়।

একে অন্যের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা স্বীকার না করিলে সমাজ থাকে না। যমজ ভ্রাতৃযুগলে কে কাহার অধীন? কিন্তু তাহাদের মধ্যেও একে অপরকে জ্যেষ্ঠ স্বীকার না করিলে গৃহবিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। —তখন বয়ঃজ্যেষ্ঠ স্বামীর নিকট কনিষ্ঠা স্ত্রী একটু মাত্র ন্যূনতায় সম্মতা না হইলে গৃহ এবং সমাজ রক্ষা পায় কৈ? শুধু সভ্য নহে, অসভ্য সমাজেও স্ত্রীর এ ন্যূনতার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃতি ও সমাজসিদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত বিধি।

লেখিকা বলেন,— "একজন ব্যারিষ্টার ডাক্তারের সাহায্য প্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিষ্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিষ্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিষ্টার ডাক্তারের স্বামী?" 'স্বামী' কথাটা কি? পরিণয়াবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ।** তন্মধ্যে 'স্বামী' পুরুষের এবং 'পত্নী' রমণীর বিশেষ সংজ্ঞা। বিশেষ সংজ্ঞা বলিয়াই ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার পরস্পরে সাহায্যকারী হইলেও কেহ কাহারও (সামাজিক অপর সংজ্ঞা 'বন্ধু' ভিন্ন) স্ত্রী বা স্বামী হন না; অথবা বিবাহ না হইলে পরস্পর সহায়তা করিলেও স্ত্রী-পুরুষ কেহ কাহারও স্ত্রী বা স্বামী হয় না।

*সমাজে ইহার যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সংখ্যানুপাতে তাহা নিতান্তই সামান্য। আর তাহা কি প্রকৃত বিজ্ঞান-সম্মত? (লেখক।)

** এ অর্দ্ধাঙ্গ কিরূপ, তাহা পরে উল্লেখ করিব।

আর 'স্ত্রী দাসী' সত্য সত্যই "দাসী" নহেন। তিনি স্নেহে জননী, সংসার নির্ব্বাহে সঙ্গিনী এবং সেবায়* দাসী স্বরূপিণী হইবেন। আবার, স্বামী যেমন 'স্বামী' তেমনি 'প্রেমদাস'ও বটেন। —তিনি প্রেমদাস নহিলেন কিসে? কিন্তু স্ত্রী যেমন সর্ব্বত্রই 'দাসী' নহেন, স্বামীও সর্ব্বত্রই 'প্রেমদাস' নহেন। সর্ব্বত্র 'দাসী' এবং 'প্রেমদাস' হইয়া থাকিলে আবার সমাজ টিঁকিত না। তবে গ্রন্থকর্ত্রী চিত্রিত 'দাসী' যে বর্ত্তমান মৃত সমাজের দোষে এবং এরূপ সমাজের সংস্কার যে আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তারপর অলঙ্কার। "অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন" ইহা নূতন কথা। সমাজবন্ধন যাহাদের মধ্যে নিতান্ত শিথিল: সেই প্রকৃতি-ক্রোড়লালিতা অসভ্যজাতীয়া রমণীগণ মধ্যে পুষ্পাভরণ এবং ধাতব অলঙ্কারের ব্যবহার কি দাসত্বের নিদর্শন, না সৌন্দর্য্যের বেশভূষা?** তবে একথা সত্য, সৌন্দর্য্যবোধ বৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই অলঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছিল, ধাতব পদার্থের মহিমায় তাহা ক্রমে মানুষের সম্পত্তি মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অলঙ্কার কখনও দাসত্বের নিদর্শন হয় নাই;—এখনও উহা সম্পত্তি এবং সৌন্দর্য্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।*** লেখিকা করুণ মধুর ভাষায় লিখিয়াছেন, —"পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগ্য পুরুষেরা টাকা উপার্জ্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক-একটি পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জ্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটু কাটব্য বলিবেন, কিন্তু সহানুভূতি করেন কৈ? ঐ শ্রমার্জ্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে

---

* স্ত্রী পুরুষের সেবা করিবেন কেন, সে কিরূপ সেবা, তাহাও পরে বলিব। (লেখক।)

** এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে পুরুষে কেন অলঙ্কার পরে না? পরে বৈ কি? —কিন্তু সে অলঙ্কার অন্যরূপ। তাহাদের সাধারণ বেশভূষার মধ্যে যে একটু পারিপাট্য, তাহাই তাহাদের পক্ষে প্রচুর অলঙ্কার। কেননা যে সমস্ত [...] পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য পুরুষকে করিতে হয়, তাহাতে স্ত্রীজন-সুলভ অলঙ্কার পরিয়া পুরুষের পক্ষে কার্য্য করা বিড়ম্বনীয় হইয়া পড়ে। উত্তর-পশ্চিমাদি অঞ্চলের স্ত্রী-অলঙ্কারের সহিত বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের গহনার তুলনা করিলে এ তথ্য বুঝা যাইবে। আরও বৈচিত্র্য দেখুন, —পুরুষের গুম্ফাদি দুই একটি স্বভাবদত্ত অলঙ্কার রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি স্পৃহায় যে কেশ বৃদ্ধি করিবার এবং নানাভাবে রচনা করিবার জন্য স্ত্রীলোকের শত যত্ন, পুরুষ তাহাকে অপেক্ষাকৃত খাট করিয়া ছাটিয়া রাখেন; কিন্তু তাহাতেই তাঁহার সৌন্দর্য্য স্পৃহার তৃপ্তি হয়। এইখানেই সৌন্দর্য্য লিপ্সার এবং অলঙ্কারের বৈষম্য বেশ বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের সুদীর্ঘ কুন্তলদামকেও কি গ্রন্থকর্ত্রী দাসত্বের নিদর্শন মনে করেন?

আর এক প্রশ্ন উঠিয়াছে,—'স্ত্রী-অলঙ্কার ব্যবহার পুরুষের পক্ষে হীনতা-সূচক কেন?' কঠোর কর্ম্মা সাহসী পুরুষে স্ত্রী-অলঙ্কার বা স্ত্রীবেশ ব্যবহারে স্ত্রী সুলভ কোমলতা আসিতে পারে, এই জন্য ইহা নিষেধ, স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী জাতীয় বেশ ব্যবহার করাই কর্ম্মোদ্ধার-কল্পে কর্ত্তব্য; তাহার বৈপরীত্যে সমাজকর্ম্মের ক্ষতি হয়। তবে পুরুষের কর্ম্ম কঠোর কেন হইল, স্ত্রীর কেন হইল না, তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বে একটু দিয়াছি, পরেও দিব। (লেখক।)

*** সধবার 'লৌহবলয়' ব্যবহার একটা আচারগত প্রথা। (লেখক।)

কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদ ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকাদ্বারা স্বর্ণকারের উদরপূর্ত্তি করিবেন। স্বামী বেচারা একসময়ে চাকরীর আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুণু রুণু রবে কাঁদিতে থাকে"* —যদি গহনা 'দাসত্বের নিদর্শন' হইত এবং স্ত্রী সর্ব্বদা 'দাসী' হইতেন, তবে এমন কটুভাষিণী, সহানুভূতিহীনা একটা 'দাসী'র মন রাখিবার জন্য হতভাগ্য স্বামীবেচারার প্রাণপণ পরিশ্রমলব্ধ শোণিততুল্য অর্থরাশির এত সহজে এমন শোচনীয় ব্যবস্থা হইত না।

অলঙ্কার যে 'দাসত্বের নিদর্শন' নহে, তাহার আর এক প্রমাণ "উল্কী"। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ইহার ব্যবহার পূর্ব্বে প্রচুর ছিল,—অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও প্রচুর। —সভ্যতাভিমানী য়ুরোপীয় পুরুষেরা পর্য্যন্ত "চাইনীজ-ইঙ্ক" দ্বারা সর্পবেষ্টিত নোঙ্গর, ক্রুশ ইত্যাদি অঙ্কিত করিয়া ভুজসৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন। ইহা দাসত্বের, না সৌন্দর্য্যের নিদর্শন?

গহনা 'সধবার নিদর্শন' হইয়াই যে 'দাসত্বের নিদর্শন' হইয়াছে, ইহা কিসে বুঝা যায়? স্বামী বিয়োগ হইলে শোকের প্রবলতায় বিধবার সৌন্দর্য্যলিপ্সা থাকে না। বিশেষতঃ যখন গ্রন্থকর্ত্রী স্বীকার করিতেছেন যে, সমাজ-বিধিতে আছে, —"বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নীচের দিকে রাখে (অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্ততঃ না দেখে!) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না দেখায়", তখন স্বামী-বিয়োগের পর হৃদয়ে শোকশল্য লইয়া বিশ্বাসী স্ত্রীলোকের পক্ষে সৌন্দর্য্যসজ্জার ইচ্ছা হওয়া একান্তই অসম্ভব। স্বামী এবং স্ত্রীর বেশভূষাপারিপাট্য মুখ্যতঃ পরস্পরের মনোরঞ্জনার্থ। সুতরাং একের অভাবে অপরের বেশভূষা সম্পাদন শুধু অনাবশ্যক নহে, সামাজিক হিসাবে গর্হিতও বটে।** দৃষ্টান্ত,—সন্ন্যাসী এবং চিরকুমারী অথবা বালবিধবা। যিনি চিরকুমারী, তাঁহার বেশভূষার পারিপাট্য সভ্যসমাজে অনর্থকর, দৃষ্টিকটু এবং অসঙ্গত। যে বালবিধবা,—স্বামী কি, ভাল বুঝে নাই, পিতা মাতা এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কার প্রাণ ধরিয়া খুলিয়া লইতে পারেন না। যত দিন বালিকা সবিশেষ বুদ্ধিমতী হইয়া আপনি অলঙ্কার ত্যাগ না করে, ততদিন তাহার অলঙ্কার ব্যবহারে কেহই বাধা দেন না। কিন্তু বুদ্ধিসম্পন্না এবং বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াও (পুনর্ব্বিবাহিতা না হইলে) সে বিধবা যদি অলঙ্কার ত্যাগ না করেন, তখন সমাজ হইতে—সেই আত্মীয়স্বজন হইতেই—সহস্র আপত্তি উঠিয়া থাকে। সেইরূপ স্ত্রীগ্রহণবিমুখ

* 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধ।

** পুরুষও পত্নীবিয়োগে বেশভূষার পারিপাট্যে অল্পাধিক উদাসীন হয়েন। তবে কঠোরকর্ম্মা কঠিনহৃদয় পুরুষ বহিঃসংসারের কঠোর কর্ত্তব্যে পড়িয়া অধিক অধীর হন না এই মাত্র। (লেখক।)

সন্ন্যাসী যদি পরিপাটি বেশে সাজিয়া সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, তাহা হইলে সে সন্ন্যাসীতে কে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইবে? —না সে সন্ন্যাসীর সমাজমধ্যে আদর-অভ্যর্থনা হইবে? ইহা হইতেই অলঙ্কার ব্যবহারের মর্ম্ম মূলতঃ বুঝা যায়।

অতঃপর সীতার কথা। "নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতাদেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। ... দেখিলে, ভগিনীগণ! ভারতবর্ষ এইরূপে নারীজাতির পূজা করে! তোমরা যদি সতীকে আদর্শ ভাবিয়া আপন আপন চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমরা কি হইতে পার? কেবল অসাধারণ প্রেমময়ী এবং পাষাণতুল্যা ধৈর্য্যময়ী।" বেশ ত। সতীর আদর্শ লিখিবার জন্যই ত সীতার চিত্র। এই জন্যই ত সীতার তুলনা সীতা। সংসারের সকল বিষয়েই যে এক সীতাকে আদর্শ ধরিতে হইবে ভারতবর্ষ কি তাহাই বলে? সীতার প্রতি রামের ব্যবহার সঙ্গত কি অসঙ্গত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিচার করা এ প্রবন্ধে অসম্ভব। তবে স্থূলতঃ ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বিপুল প্রকৃতিপুঞ্জের স্বার্থের জন্য প্রকৃত রাজাকে ব্যক্তিগত সকল স্বার্থই বিসর্জ্জন দিতে হয়। রাম তাহা করিয়া রামের উপযুক্ত কার্যই করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের কাছে ইহা ভিন্ন আর পথ ছিল না।

(ক্রমশঃ)

কোহিনূর, আশ্বিন ১৩১৩

৩

এখন অর্দ্ধাঙ্গ-সম্পর্ক এবং স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতি লইয়া (কঠোরতা-কোমলতা এবং শাসন ও সেবা সম্বন্ধে) আলোচনা করা যাউক।

স্ত্রী পুরুষের অধীন না হইলে স্ত্রীকে পুরুষের সমান কাজ করিতে হইত; কিন্তু তাহাতে অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। তাই নানা কারণে স্ত্রীর অপটুতায়, স্বভাব ও সমাজ উভয়ে মিলিয়া সংসারের সমধিক পরিশ্রম-সাধ্য কঠিন কার্য্যগুলি পুরুষের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিল। সেই হইতে পুরুষ এতকাল কঠোরতার মধ্যে গঠিত হইয়া আসিয়াছে। প্রকৃতির দুইটি মূর্ত্তি—কঠোর এবং কোমল। স্ত্রী তাই সমাজের কোমলভাগে পরিণত হইয়াছেন। এই কোমল-কঠোর বৈষম্য না থাকিলে সমাজ-সংসার টিকিত না। লেখিকা যে 'Sweet home'-এর কথা বলিয়াছেন, সে Home-এ কি হয়? —

"Here man, creation's tyrant casts aside
His sword and sceptre, pageantry and pride,
While in his softened looks benignly bend
The sire, the son, the husband, brother, friend."

হেথায় মানব, —সংসারশাসক আসি,'
ত্যজি সুখে হাসি'
ভীম অসি, রাজদণ্ড, সমারোহ আর,
দণ্ড যত তা'র,
আনত নয়ন প্রেমে অভিভূত হিয়া,
প্রেমে শিহরিয়া
পিতা, পুত্র, পতি, ভ্রাতা, প্রিয়বন্ধু-সম
রাজে অনুপম!

আর এ গৃহে—

"Here woman reigns; the mother, daughter, wife,
Strew with fresh flowers the narrow way of life!"

ললনার লীলাভূমি এ মর্ত্ত্য-ত্রিদিবে
জায়া, মাতা সবে
কঠোর জীবন পথ দেয় বিছাইয়া
প্রেমপুষ্প দিয়া!

এ মর্ত্ত্য-ত্রিদিবের ললনারাজ্ঞীর কেমন মূর্ত্তি?

"In the clear heaven of her delightful eye,
An angel-guard of loves and graces lie."

নির্ম্মল উজল তাঁর গগন-তুলন
প্রশান্ত নয়ন,
রাজে তাহে প্রেম দয়া, স্নেহ মূর্ত্তিমান,
মমতা কল্যাণ!

আর কিরূপ তথাকার কর্ম্মের চিত্র? —

Around her knees domestic duties meet,
and fireside pleasures gamble at her feet."

লক্ষ্য গৃহকার্য্য হয় সম্পাদিত দ্রুত
সে শক্তি সম্ভূত
করুণায়। প্রেমনৃত্যে খেলে শিশু হর্ষে
তারি পদপার্শ্বে।

পাশ্চাত্য দেশেও সুগৃহের ইহাই প্রকৃত আদর্শ চিত্র। বাস্তবিক অন্তঃপুর মধ্যে মমতা কল্যাণ ঢালিয়া দিয়া, শান্তির অনন্ত বিমল আনন্দের প্রবাহ বহাইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদনই স্ত্রীর সেবাব্রত। রাজা যদি প্রকৃত পক্ষে দেশের সেবক, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, ললনা-রাজ্ঞী তবে গার্হস্থ্য ব্যাপারে সেবিকা দাসী না হইবেন কেন? সংসারে প্রলয় এবং বহ্নিসংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সমাজে এই শান্তির বিধি হইয়াছে। শান্তিপূত অন্তঃপুরের শান্তিময়ী এই কোমলা মূর্ত্তি—রমণী; আর কঠোর বহিঃসংসারের কঠিন ছবি—পুরুষ। পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ হইলেও কোমলতা ও কাঠিন্যানুযায়ী রমণী ও পুরুষের কর্ত্তব্য বিভিন্ন প্রকার। স্ত্রী পুরুষের অঙ্গবিভাগ দিবা-রাত্রির ন্যায়। পুরুষ তপ্ত দিবাভাগ, —রমণী জ্যোৎস্নাময়ী স্নেহশান্তিরূপিনী যামিনী। অথবা পুরুষ কুঠারের লৌহফলক, স্ত্রী তাহার কাষ্ঠদণ্ড। উভয়ের সহায়তা ভিন্ন সংসার-বৃক্ষ ছেদন করা চলে না। কিন্তু উভয়ের কর্ম্ম পাশাপাশি,—অথচ বিভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী'-তে এ তথ্য সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। পুরুষ-ভাবে গঠিত হইলেও প্রফুল্লকে পরিণামে পতি ব্রজেশ্বরের স্বামিত্ব স্বীকার করিয়া সেবাব্রত গৃহিণীধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। স্বামিত্ব স্বীকার করিলেই 'গোলাম' হইতে হয় না,—অভিভাবক স্বীকার করা হয় মাত্র। এরূপ না করিলে সভ্যতার গৌরব করা যায় না; সমাজও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়।

"পুরুষের গৃহই স্ত্রীর গৃহ, স্ত্রীব স্বতন্ত্র গৃহ নাই।" ইহাতে স্ত্রীর ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। যেমন বীজগত বংশ এবং ক্ষেত্রের নামকরণ হয়, তেমনই পিতৃগত কুল এবং গৃহের নামকরণ হয়। ইহা কৃত্রিম সভ্য-সমাজের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণোদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিধি। স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্র গৃহ হইলে সমাজ-বন্ধনে শিথিলতা আসিত। পাশ্চাত্য দেশে অনেকেরই গৃহ নাই; পিতা আসিয়া পুত্রের আবাসে ভোজন করিয়া গেলে 'বিল' পরিশোধ করিতে হয়। সে দেশেও স্বামী স্ত্রীর আবাস স্বতন্ত্র নহে। সেরূপ স্ব-স্ব প্রধান হইতে গেলে সমাজ থাকে না,—গৃহ থাকে না। প্রাচ্যের আদর্শ সেরূপ নহে। প্রাচ্যের সুদৃঢ় সমাজবন্ধনে হিন্দু-মুসলমান কেহই উক্তরূপ দৃশ্য কখনও দেখিতে চাহিবেন না।

"গৃহ বলিতে আমাদেরই একটি পর্ণকুটীর নাই। প্রাণীজগতে কোন জন্তুই আমাদের মত নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে, নাই কেবল আমাদের।

* * * * *

'এত বড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়া' বলিয়া আমি ভুল করি নাই। এ কথার প্রতিবর্ণ সত্য। আমরা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি। প্রভুদের বাটী যে আমাদিগকে সর্ব্বদাই রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু যখন আমাদের চালের উপর খড় না থাকে, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের শেষ চালখানা ঝঞ্ঝানিলে উড়িয়া যায়,—টুপ্‌টাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজিতে থাকি, চপলাচমকে নয়নে ধাঁধা লাগে,—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে এবং আমাদের বুক কাঁপে,—প্রতিমুহূর্ত্তে

ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই,—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি! ... অথবা গেরস্তের বৌ-ঝি রূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি। আর যখন চৈত্রমাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়,—সব জিনিসপত্র সহ ঘরগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে,—আমরা একবসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি,—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!! (জানি না, কবরের ভিতরেও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কিনা!!)।" .

গ্রন্থকর্ত্রী ভুল বুঝিয়াছেন। কন্যাকে পিতামাতার, বধূকে শ্বশুর-শাশুড়ীর অভিভাবকত্ব স্বীকার করিতে হইবে না—এ কেমন কথা? তবে পুত্রও ত পিতার অভিভাবকত্ব স্বীকার না করিলে পারে! এই সকল কথায় কি সমাজ-বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ভাব বুঝা যায়? স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য প্রকৃত সমাজ-সম্মত হইতে পারে না। এ যে মানবের সমাজ বন্ধন, ইহা প্রধানতঃ স্ত্রীজাতিকে আশ্রয় দিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল। পুরুষ বরং আশ্রয়হীন হইয়া থাকিতে পারে, স্ত্রী সর্ব্বত্র তাহা পারেন না। সুতরাং স্ত্রীর অভিভাবক প্রয়োজন। যে কারণে অন্তঃপুরের সৃষ্টি, যে কারণে বোরকা ব্যবহারের প্রয়োজন, সেই সকল কারণেই স্ত্রী এবং পুরুষের কর্ত্তব্য—সুতরাং কর্ম্মক্ষেত্র—এক বা সমান নহে; এবং স্ত্রীর অভিভাবক প্রয়োজন। অভিভাবক বিধি বিধান করিয়া সমাজ স্ত্রী-জাতিকে আশ্রয় দিয়াছে,—নানা বিপদ হইতে রক্ষার উপায় করিয়াছে। সমাজের এই উৎকৃষ্ট বিধি তাঁহাদের প্রতিকূল নহে,—এ বিধি স্ত্রীজাতিকে কখনও নিরাশ্রয় করিয়া দেয় নাই। "ইংরাজীতে Home বলিলে যাহা বুঝা যায়, 'গৃহ' শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই।"

লেখিকা তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। স্ত্রী-পুরুষের গৃহ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইলে,—গৃহ অভিভাবক-হীন হইলেই কি ঐ 'Home' হইত? ওরূপ হইলে বস্তুতঃ সে Home 'Sweet Home' হইত না, Bitter Home হইত। সম্মিলিত পরিবারের "গৃহ" যে শান্তি, যে সমবেদনা-সহানুভূতি,—পরস্পরের সহায়তায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায়—সুখনিকেতন হয়, মর্মমধুর মুক্ত কলহাস্যে মুখরিত হয়,—স্বতন্ত্র গৃহ সেরূপ হইত না। ঠাঁই-ঠাঁই হইলে শক্তি কমিত, স্ত্রী-পুরুষের 'পরস্পরে অর্দ্ধাঙ্গ' আখ্যা অনর্থক হইত।

স্ত্রী যখন বৃষ্টিধারায় ভিজিতে থাকে, তখন কি পুরুষ-অভিভাবকের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে? যখন দুষ্টলোক-কর্ত্তৃক লঙ্কাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন কি স্ত্রীদিগকে রক্ষা করাই পুরুষের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই?

তবে, এমন পুরুষ অভিভাবক যদি কেহ থাকেন, যিনি স্ত্রীর বিপত্তি কালে নিদ্রা যান, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা মৃত সমাজের ব্যক্তিগত বিকৃত চিত্র। তাহার সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক।

সংস্কার অবশ্যই আবশ্যক; কিন্তু সে সংস্কার দেশ, কাল ও পাত্রানুযায়ী হওয়া উচিত। শীতপ্রধান প্রতীচ্যে যে সকল সমাজবিধি সঙ্গত, উষ্ণ প্রাচ্যে সে সমস্তই ঠিক উপযুক্ত নহে। কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দ্বিবিধ শ্রেণীকে স্ব স্ব উপযোগীভাবে—কোমল এবং কঠোর এই দ্বিবিধভাবে গঠন করাই সঙ্গত।

অতএব তাঁহাদের শিক্ষাও পুরুষের মত না হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্যোপযোগী হওয়া উচিত। প্রকৃত সুগৃহিণী যাহাতে হইতে পারেন, তাঁহাদের সেইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন। গ্রন্থরচয়িত্রী 'জেনানা স্কুল-কলেজ' চাহিয়াছেন। 'পাশ করা বিদ্যা' যদি 'শিক্ষা না' হইল, তবে জেনানা-স্কুল-কলেজের কি প্রয়োজন?* আর সেখানে শিক্ষাই বা হইবে কিরূপ? যত্ন করিলে মহিলারা গৃহেও যে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, গ্রন্থকর্ত্রীই স্বয়ং তাহা আমাদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন। সমাজ উদার হইলে শিক্ষা লাভে স্ত্রীজাতির কোনই বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই।

তুলনায় স্ত্রীজাতির শক্তিহীনতা, কর্ত্তব্যের ও শিক্ষার বিভিন্নতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা স্ত্রী-পুরুষের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে। জননী-সন্তান সম্পর্কে জননীরূপ রমণীই সংসারে সর্ব্বপ্রধানা। এখানে পুরুষ নগণ্য,—জননীই সব। সন্তানের কাছে সংসার জননীর মহীয়সী শক্তির অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র—জননীর অব্যক্ত অবর্ণনীয় অনন্ত প্রেমমধুর শান্তি মূর্ত্তিময় আনন্দভবন।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই—জন্মিয়াই মাকে দেখে;—কাঁদে মা বলিয়া, জানে কেবল মাকেই। মার স্তন্য-অমিয়-মর্য্যাদা সংসারের সকলের উপর। —বিশ্বের সকল বিষয়ে মার মহিমা দেখিবার জন্য অন্তর এত ব্যাকুল। মা নামে প্রাণে প্রেম উথলে, শরীরে পুলক দেয়, আবেশে নয়ন গলে—এই জন্য। শোকে সন্তপ্ত, যাতনায় জর-জর—নিরুপায়—নিঃসহায়ে এই জন্যই শান্তির আশায় মা, মা বলিয়া ছুটে! মা এই জন্যই মা! মার তুলনা নাই,—মার বড় নাই। মাতৃরূপে জননীজাতি নিখিল ভুবনে অতুলনীয়, মা নিখিল নম্যা। মাতৃরূপিণী জননীজাতির চরণধূলি রেণুতে এমন কোটি কোটি পুত্র—কোটি কোটি বিশ্ব যুগ-যুগ হইতে প্রেমবিভোরে লুটাইয়া ঘুমাইতেছে।**

---

* পূর্ব্বতন কালে হিন্দু মুসলমান মধ্যে যে সকল স্ত্রী পুরুষোচিত বিদুষী হইয়াছিলেন, পুরুষের অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত—আর তাঁহারা কয়জনে স্কুল কলেজের শিক্ষা পাইয়াছিলেন? স্ত্রীর পুরুষোচিত বিদ্যা, আর পুরুষের স্ত্রী-উচিত বিদ্যাচর্চ্চায় প্রশংসা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা করা বেশীর ভাগ মাত্র। কোন কোন পুরুষ যে পাকপ্রণালী বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহা না করিলে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যাইত কি? এ বিষয়ে বরং স্ত্রী-লেখিকার কাছেই সমাজ আশা করিয়া থাকেন। পুরুষের লেখা বেশীর ভাগ মাত্র। পুরুষের সকল কার্য্য স্ত্রী এবং স্ত্রীর সকল কার্য্য পুরুষে পরিবর্ত্ত-গ্রহণ করিলে যেমন অঘটন হইত, জাতিগত ও প্রকৃতিগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া যার যার ইচ্ছামত কার্য্য লইলেও সমাজে সেইরূপ একটা অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ঘটিত। কোন ব্যবসায়ই উৎকর্ষলাভ করিত না।

** মার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াও পুরুষ-শিশুতে পৌরুষভাব ফুটে, কন্যা কোমল হয়—স্বভাবের নিয়মে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম—ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। (লেখক।)

বলিয়াছি, পাশ্চাত্য আদর্শ প্রাচ্যের উপযোগী নহে। গ্রন্থরচয়িত্রীর নামের পূর্ব্বে, 'মিসেস্' সংযোগ দেখিয়া পাশ্চাত্যে যে তাঁহার অনুরাগ আছে, তাহা বুঝিলাম। ইহা বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয়। প্রাচ্যের কি কিছুই নাই,—না ছিল না? আমরা জানি, প্রাচ্যের সংস্পর্শেই পাশ্চাত্য আজ এত উন্নত। কাচ, টিন, মাটির দুইটা বিলাস-সামগ্রী, তামসিক উন্নতিসূচক ঐশ্বর্য্যসম্ভার লইয়া নবাভ্যুত্থিত প্রতীচ্য উপস্থিত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাব-বৃদ্ধ প্রাচ্য কি সর্ব্বদা তাহার অনুকরণ করিবে? আমরা এমন কথা বলি না যে, পাশ্চাত্যের কাছে বর্ত্তমানে আমাদের কিছুই শিখিবার নাই; কিন্তু প্রকৃত সভ্যতা এবং সমাজাদি সম্বন্ধেও কি প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট শিখিতে যাইবে? আমাদের বহির্ব্বাটী যে কারণেই হউক, পাশ্চাত্যের ভাবসাগরের তরঙ্গ মধ্যে ডুবু-ডুবু। আমাদের অন্তঃপুরও যদি ঐ ভাবে ডুবিতে যায়, তবে বড় আশঙ্কার কথা। আমরা তাহা আশা করি না। অন্তঃপুরে প্রাচ্যভাব আছে বলিয়াই আজও প্রাচ্যের চিহ্ন সংসারে টিকিয়া আছে। আমরা কামনা করি, প্রাচ্য-ললনা প্রাচ্যভাবে জাগিবেন।

ভারতললনা না জাগিলে দেশ জাগিবে না সত্য, কিন্তু জেনানা-কলেজ করিয়া পুরুষের পূর্ণদাসত্ব শিক্ষার দিনে স্ত্রীরাও দাসত্বোপযোগী শিক্ষা শিখিলে এবং সেই ভাব সন্তানাদিতে বর্ত্তাইলেই কি দেশ জাগিবার উপায় হইবে? এ শিক্ষা ত শিক্ষা নহে। বরং দেশ জাগাইতে হইলে পুরুষেরও বর্ত্তমান শিক্ষার পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। ভারতললনা প্রকৃত ভারতললনার উপযুক্ত সুগৃহিণী এবং সুজননী যাহাতে হইতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা পাইলেই দেশ জাগিবে,—অন্যরূপ শিক্ষায় নহে।

অতএব সন্তানকে সুসন্তান করিতে হইলে সুজননী গঠন কর্ত্তব্য। এইজন্য আমরা অন্তঃপুরে জননীজাতির পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে চাই। অন্তঃপুরে মুক্ত বায়ুর, মুক্ত আলোর প্রবেশ দেখিতে চাই। উপযোগী স্ত্রীশিক্ষায় সমাজের উদারতার আকাঙ্ক্ষা করি। ব্যায়াম,—সুগৃহিণীরা তাঁহাদের গৃহকার্য্যগুলি যত্নে সুলক্ষ্যে সম্পাদন করিলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা এইরূপ সংস্কারই কামনা করি। ইহাতে তাঁহাদের ভীরুতা ঘুচিবে, অথচ কোমলতার ব্যাঘাত ঘটিবে না। প্রাচ্যের উন্নতি পাশ্চাত্য ভাবে নহে; প্রাচ্য ভাবেই হইবে।

এখন এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যখন 'নবনূরে' স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছিলাম, তখন ঐ সকলের কতক কথায় সহানুভূতি ছিল, কতকে ছিল না। সাময়িক দুই একটা প্রতিবাদও হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে। তখন জানিতাম না, লেখিকা পূর্ব্বাকারেই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থনিবদ্ধ করিবেন। এ কয় প্রবন্ধে 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধে সংস্কার আবশ্যক ছিল। তথাপি তাঁহার 'মতীচুরে'র দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আশায় সকল সাহিত্যহিতৈষীই উদগ্রীব রহিয়াছেন; আমরাও রহিলাম। ভরসা করি দ্বিতীয় ভাগে আমরা মনোমত বস্তু পাইব। 'পিপাসা' আমাদিগকে যেরূপ পিপাসিত করিয়াছে, আমরা অচিরে তদুপযুক্ত সুশীতল জল পাইবার কামনা করি।

ভগবানের কাছে আমরা রচয়িত্রীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। আর কামনা করি,—সমাজের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল প্রকৃত ক্ষত চিত্র দেখাইয়া সমাজ সংস্কারে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, সে সমস্তের উপযুক্ত সংস্কার হউক। তাঁহার মঙ্গল-উদ্দেশ্য পূর্ণ হউক,—তাঁহার পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করুক।

যাঁহার সহায়তায় তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা-প্রসূত এ অমূল্য রত্নখণ্ড তিনি তাঁহার সেই হৃদয়বান ভ্রাতার নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহাতে শুধু লেখিকার নহে, পাঠকেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সেই সহৃদয় ভ্রাতার প্রতি স্বতঃই উৎসারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।[১০] গ্রন্থরচয়িত্রী তাঁহার কর্ত্তব্য ভাল বুঝিয়াছিলেন; পাঠকেরাও কর্ত্তব্য ভুলিবে না।

গ্রন্থকর্ত্রীর সাধনা সফল হউক। গ্রন্থের কোন-কোন বিষয়ের সহিত আমাদের মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা তাঁহার লেখনীর ক্রমোন্নতি ও সাফল্য বাঞ্ছা করি।

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার।

কোহিনুর, মাঘ ১৩১৩
